শ্রীসীতা দেবী

সিটি বুক সোসাইটি
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪১]   [মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক :—

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী,

৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার

সূচীপত্র

কথা-সপ্তক

অরণ্য-ভৈরব

বহুকাল আগে এক পাহাড়-ঘেরা দুর্গে এক ক্ষত্রিয় সামন্তরাজ বাস করতেন, তাঁর নাম মল্লদেব। তাঁর যে দেশ, সেখানে বাইরের থেকে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল, বাইরের শত্রু শত-সহস্রবার হানা দিয়েও সেই কৃষ্ণকায় ভীষণ দানবের মত পাহাড়কে জয় ক'রে ভিতরে আস্‌তে পারেনি। মল্লদেব নামেই সামন্তরাজ ছিলেন, সম্রাটের চেয়ে তাঁর প্রতাপ বেশী বই কম ছিল না। তাঁর শাসনাধীনে বাস কর্‌ত যারা, তারা কোনওদিন কোনও বিষয়ে তাঁকে অতিক্রম কর্‌তে সাহস কর্‌ত না। তাই ব'লে তিনি যে অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তা নয়। তাঁর বিরুদ্ধা-

চরণ করলে তিনি হিংস্র পশুর মত ভয়ানক হয়ে উঠতেন বটে, কিন্তু তাঁকে মেনে চললে তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতেও কাতর হতেন না। পিতা যেমন যত্নে নিজের সন্তানকে রক্ষা করেন, সেই ভাবেই তিনি দেশের অধিবাসীদের রক্ষা করতেন।

তাঁর রাণী বিজয়াও ছিলেন তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী। ক্ষত্রিয়ের মেয়ের যেমন হতে হয়, তিনি ঠিক তেমনিই ছিলেন। তাঁর মনে ভয়ের লেশও ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে স্নেহেরও অভাব ছিল না। যুদ্ধে বিগ্রহে স্বামীর পাশে ঘোড়ায় চ'ড়ে রণক্ষেত্রেও তাঁকে দেখা যেত, আবার দুঃখী-দরিদ্রের ঘরে মূর্ত্তিমতী করুণার মত, অন্নপূর্ণার মতও তাঁকে দেখা যেত।

এক দুঃখ ছিল এঁদের। প্রকাণ্ড প্রাসাদ লোকজনে গম্‌গম্ করত, কিন্তু তার ভিতর শিশুর কাকলি কোনওদিন শোনা যেত না। বিজয়ার চোখে হাজার আলোয় আলোকিত ঘরগুলো আঁধার ঠেকত, তাঁর মন ছট্‌ফট্ করত—তাঁর দীনতম

প্রজার কুড়ে ঘরে পালিয়ে যাবার জন্যে, তাদের ধূলোকাদা-মাখা খোকাখুকিগুলোকে নিয়ে খেলা করবার জন্যে। সন্তানলাভের আশায় তিনি কত ব্রত, কত উপবাস যে করতেন, কত তীর্থ-ভ্রমণ, কত দানধ্যান যে করতেন, তার আর গোণা-গুণতি ছিল না।

মল্লদেবের রাজ্যের চারিদিকে নিবিড় বন, তার ভিতর ছিল এক দেবমন্দির। কতকালের পুরানো যে তা কেউ বলতে পারে না। আগে নাকি সে জায়গায় গ্রাম ছিল, কি একটা মহামারী হয়ে গ্রামের বেশীর ভাগ লোক মারা গেল, যারা বেঁচে ছিল, তারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে দূরে গিয়ে ঘর বাঁধল। কেবল দেবমন্দিরের পুরোহিত পালালেন না। দেবতা মৃত্যুভয়ের অতীত, তাঁর পূজারীরও ভয় পাওয়া সাজে না। তাই সেই গহন বনের ভিতর একলা রইলেন প'ড়ে পাষাণময় বিগ্রহ আর তাঁর সেবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গ্রামবাসীরা প্রথম প্রথম পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে মন্দিরে আসত, ক্রমে তাও ছেড়ে দিল। চারিদিকের বন গহন

থেকে গহনতর হতে লাগল, হিংস্র জন্তুতে ভ'রে উঠ্‌ল। পূজারী ব্রাহ্মণ কবে যে মারা গেলেন, তাঁর স্থান কে কি ভাবে পূর্ণ কর্‌ল, সে খোঁজ নিতে কারও ভরসা হল না। বহুযুগ কেটে গিয়েছে, তবু এখনও কিন্তু সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টাধ্বনি গভীর বনের বক্ষভেদ ক'রে মানুষের কানে এসে পৌঁছায়।

পূর্ণিমার তিথি। সকাল থেকে রাণী বিজয়া স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে, রাজ্যের যত দীন-দুঃখীকে ভিক্ষা বিতরণ কর্‌ছেন। প্রতি পূর্ণিমাতেই তিনি এরকম করেন। এই আশায় করেন যে এতে যদি দেবতা তুষ্ট হয়ে তাঁর কোলে একটি শিশু পাঠিয়ে দেন। সব ভিখারীরা চ'লে গেল, ব'সে রইল এক অন্ধ বৃদ্ধ। রাণী তাকে জিগ্‌গেস কর্‌লেন, "তুমি কি আর কিছু চাও ?"

সে বল্‌লে, "কিছু না মা। কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, আপনি আর আমাদের মহারাজ যেন অরণ্য-ভৈরবের পূজা দিতে চ'লে গেলেন। ফিরে যখন এলেন, আপনার কোলে রাজপুত্র।" ব'লে বুড়ো উঠে চ'লে গেল।

………বসে রইল এক অন্ধ বৃদ্ধ। রাণী তাকে জিগ্‌গেস করলেন, "তুমি কি আর কিছু চাও?"

রাণী বিজয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্ধ বৃদ্ধ এ কি ব'লে গেল! এ কি শুধুই স্বপ্ন, না এর ভিতর সত্যও কিছু আছে? হবেও বা। হয়ত তার বাইরের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তরের দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়েছে। অন্য মানুষের কাছে যা অজ্ঞেয়, সে হয়ত তা জান্‌তে পারে।

কিন্তু অরণ্য-ভৈরবের মন্দিরে যাওয়া, সে ত সহজ ব্যাপার নয়! মন্দিরের কাছে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে—এমন ত কোনও মানুষ রাণী দেখেননি। তবু তাঁকে যেতে হবে। মহারাজ সঙ্গে থাকলে বিজয়ার সাক্ষাৎ যমপুরীতে যেতেও ভয় নেই।

মল্লদেব যখন অন্তঃপুরে এলেন, তখন বিজয়া তাঁকে সব কথা বল্‌লেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "সে যে বড় ভয়ানক পথ, তুমি পারবে যেতে?"

বিজয়া বল্‌লেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে পারব।"

সেই দিন থেকে অরণ্য-ভৈরবের মন্দিরে যাত্রার আয়োজন চল্‌তে লাগল। আয়োজন কিছু নিয়ে

যাবার জন্যে নয়, যা রেখে যাচ্ছেন—তার সুব্যবস্থার জন্যে। যদিই তাঁরা না ফেরেন, বলা ত যায় না? যাবেন তাঁরা তীর্থ-যাত্রীর মত, রাজ-ঐশ্বর্য্যের ঘটা কিছু তার ভিতর থাকবে না।

দিন দশ-বারোর ভিতর তাঁদের সব কাজ চুকে গেল, তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ রইল না। রাজা পর্‌লেন সাধারণ সৈনিকের বেশ, কারণ সশস্ত্র হয়ে যেতে হবে। রাণী চল্‌লেন সাধারণ গৃহস্থ-বধূর বেশে, হাতে একগাছি ক'রে সোনার কঙ্কণ ছাড়া আর কোন গহনাও তাঁর রইল না!

রাজ্যের অর্দ্ধেক লোক রাজারাণীকে বিদায় দেবার জন্যে বনের গোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। রাজারাণী যখন সেই অন্ধকার বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন তারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে গেল।

সে কি ভীষণ বন! এ রকম জায়গা রাজা বা রাণী স্বপ্নেও কোনওদিন দেখেননি। বনের ভিতরকার আঁধার এমন গভীর, যে মনে হয়

সৃষ্টির গোড়া থেকে সূর্য্যের আলোর একটি রেখাও কখনও এখানে প্রবেশ করেনি। সেখানকার নিস্তব্ধতা এমন অটুট, এমন ভয়াবহ, যে মনে হয় বাইরের জগতের হাওয়াও যেন এর মধ্যে ঢুকে গাছের পাতাটিতে নাড়া দিতে ভয় পায়। এই ভীষণ বনের ভিতর দিয়ে, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে, রাজা আর রাণী দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে চল্‌লেন।

বনের ভিতর পথের কোনও চিহ্ন নেই। অরণ্য-ভৈরবের মন্দির কতদূরে কে জানে! কতখানি যে বেলা হল, তাও বুঝ্‌বার কোনও উপায় নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হয়ে, মল্লদেব আর বিজয়া একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লেন।

সামান্য কিছু খেয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তি ক'রে ও বিশ্রামে একটু সুস্থ হয়ে, তাঁরা আবার চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, বনের ভিতরের আঁধার গাঢ় হয়ে উঠ্‌ছে, এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে গিয়ে চারিদিকে কিসের যেন একটা

সাড়া জেগে উঠ্‌ছে। রাজা বল্‌লেন "এইবার সাবধান।"

কিন্তু এই ভীষণ অন্ধকারে বেশীক্ষণ আর চলা গেল না। রাজারাণী আবার গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ব'সে নিদ্রাহীন চক্ষে রাত্রি কাটিয়ে দিলেন। বিজয়া দু-একবার ঢুলে পড়লেন। কিন্তু মল্লদেবের চোখে এক নিমেষের জন্যও পলক পড়ল না।

ক্রমে আঁধার তরল হয়ে আসতে লাগ্‌ল, তাঁরা বুঝলেন ভোর হচ্ছে। আগুন নিভিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে চল্‌লেন।

দ্বিতীয় দিনও প্রথম দিনের মত কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় মনে হল, অনেক দূরে কোথায় যেন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, ঘণ্টাধ্বনি যেন ভেসে আস্‌ছে; রাণী বিজয়ার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন "ঐ বোধহয় অরণ্য-ভৈরবের মন্দির।"

রাজা বল্‌লেন, "তাই হবে, ভৈরবের বিশেষ কৃপায় আমরা এতদূর নিরাপদে এসেছি, নইলে

কোনও মানুষ এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যায় বলে শুনিনি।”

কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তাঁদের বাধা দিল। আগের রাত্রির মত আজও তাঁদের জেগে ব’সে থাকৃতে হল। চারিদিকে আগুন জ্বল্‌ছে, যাতে কোনও বন্যজন্তু অতর্কিতে তাঁদের আক্রমণ না করতে পারে। কারা যেন সারি সারি হেঁটে চলেছে, তাদের কথার গুঞ্জন, মেয়েদের অলঙ্কারের শিঞ্জন, সব শোনা যাচ্ছে, খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। আস্তে আস্তে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার কারা আসছে? তাদের পায়ের শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে, তাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, গভীর অরণ্যকে সজাগ ক’রে তুলেছে। কোথায় যাচ্ছে এরা, কোন্ দিগ্বিজয়ে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল, বন আবার নীরব নিঝুম।

ক্রমে অন্ধকার কেটে গেল, পূর্ব্বদিগন্তের বক্ষভেদ ক’রে সূর্য্যদেব আলোর প্লাবন ছুটিয়ে দিলেন। মল্লদেব আর বিজয়া উঠে পড়লেন।

ঐ ত দেখা যায় অরণ্য-ভৈরবের মন্দিরের চূড়া। আশায় তাঁদের হৃদয় ভ'রে উঠ্‌ল, তাঁরা মহোৎসাহে এগিয়ে চল্‌লেন।

ভৈরবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে কত শতাব্দীর ঝড় বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য ক'রে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার কাল পাথরের দেওয়ালে কোথাও ফাট ধরেনি, কোথাও আগাছা জন্মায়নি। মন্দিরের চূড়ার উপর যে ত্রিশূল বসান, তার ইস্পাত এখনও ঝক্‌ঝক্ করছে। মন্দিরের বিশাল জোড়া-কপাট বন্ধ। রাজা ডেকে বল্‌লেন, "কে আছ, দরজা খোলো, আমরা তীর্থ-যাত্রী, পথশ্রমে বড় কাতর।"

প্রথমে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর কে যে কপাট খুল্‌ল, তা তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন না, কিন্তু দরজা আস্তে আস্তে দুফাঁক হয়ে তাঁদের ভিতরে যাবার পথ ক'রে দিল। মল্লদেব আর বিজয়া ভিতরে ঢুক্‌লেন।

দেবতার চরণে উৎসর্গ কর্‌বার জন্যে তাঁরা কোনও অর্ঘ্য নিয়ে আসেননি, কিন্তু এমনি কি ক'রে প্রণাম কর্‌বেন? মল্লদেব কোমরবন্ধ থেকে তাঁর

ইস্পাতের ছোরাখানি খুলে দেবতার চরণে রেখে প্রণাম করলেন, রাণী হাতের একমাত্র অলঙ্কার সোনার কঙ্কণ খুলে দিলেন।

পূজো শেষ ক'রে তাঁরা মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরের দালানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিজয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন, তিনি সেই শান-বাঁধান মেঝের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মল্লদেব খানিকক্ষণ জেগে থাকবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুই রাত না ঘুমিয়ে তিনিও অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন, দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতে কোন এক সময় তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন।

একই সময়ে হঠাৎ কি ক'রে তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলেন, সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এসেছে, বনের ভিতর ছায়া গভীর হয়ে আসছে। রাজা ব'লে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য, আমরা এতক্ষণ ঘুমিয়েছি ?"

রাণী বললেন, "আমি কি সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম।"

রাজা বললেন, "স্বপ্ন ত আমিও দেখেছি, কিন্তু তুমি কি দেখেছ, আগে বল।"

বিজয়া বল্‌লেন, "আমি দেখলাম, দেবী পার্ব্বতী আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'দেবমূর্ত্তির পায়ের কাছে তাঁর প্রসাদী ফল পাবে, তাই নিয়ে যাও। শুক্‌নো ফল যেদিন আবার সরস, সতেজ রূপ ধরবে, সেদিন সেটিকে খেও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'"

মল্লদেব বল্‌লেন, "কি আশ্চর্য্য, আমিও ঠিক ঐ স্বপ্নই দেখেছি। শুধু আমার মাথার কাছে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পার্ব্বতী নন, একজন সন্ন্যাসী। চল মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেখা যাক্, স্বপ্নের ভিতর সত্য কিছু আছে কিনা।"

ছু'জনে আস্তে আস্তে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। সত্যিই ত, ছুটি ফল প'ড়ে রয়েছে, দেবমূর্ত্তির পায়ের কাছে। বিজয়া তাড়াতাড়ি সে ছুটি তুলে নিলেন আঁচলে ক'রে।

আবার তাঁরা বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাজা বল্‌লেন, "আজ রাত যেমন করে হোক এখানে কাটাতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায়?"

রাণী বল্‌লেন, "দুদিন এক-রকম না খেয়েই কেটেছে, আজও না-হয় তাই কাট্‌বে। অরণ্য-ভৈরবের প্রসাদী ফল দুটি এখন ত খাবার জো নেই, নইলে তাই দিয়েই আজ আমরা ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর্‌তাম।"

রাজা বল্‌লেন, "কবে যে শুক্‌নো ফল আবার টাট্‌কা হয়ে উঠ্‌বে, তা ত কিছু বোঝা গেল না। আরও কতদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে কে জানে?"

রাণী বল্‌লেন, "দেখাই যাক, এতটা করুণা যখন দেবতা আমাদের উপরে করেছেন, তখন অল্পের জন্যে অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। হয়ত আজ রাত্রে স্বপ্নে আবার আমরা তাঁর অদেশ পাব।"

রাজা রাণী মন্দিরের দালান থেকে নেমে চারিদিক্‌ ঘুরে দেখ্‌তে গেলেন, কোথাও ফল কি জল কিছু পাওয়া যায় কিনা।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েক পা যেতে না যেতেই তাঁরা সুন্দর একটি ঝরণা দেখ্‌তে পেলেন। অথচ কাল এই পথে মন্দিরে আসবার সময় এটি

মোটেই তাঁদের চোখে পড়েনি। শুধু ঝরণা নয়, তার আশে পাশে গাছে কি চমৎকার গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা ফল ঝুল্‌ছে। রাজারাণীর মুখে আর কথা ফুট্‌ল না। নীরবে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তাঁরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ক'রে মন্দিরে ফিরে এলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রির আঁচলের তলায় সমস্ত বন আড়াল হয়ে গেল। রাজা রাণী মন্দিরের ভিতরে ঢুকে, সকাল হবার আশায় ব'সে রইলেন।

খানিক ব'সে থাকার পর, এ রাত্রেও তাঁরা ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। স্বপ্ন দেখ্‌লেন আবার, দেবতা সন্ন্যাসীর রূপ ধ'রে বল্‌ছেন, 'যেদিন তোমরা সব চেয়ে বড় স্বার্থ ত্যাগ করবে, সেইদিন শুক্‌নো ফল তাজা হয়ে উঠ্‌বে।'

পরদিন সকালে উঠে, পূজা শেষ ক'রে মল্লদেব আর বিজয়া নিজেদের রাজ্যে ফিরে চল্‌লেন। মন্দিরের পথে তাঁদের প্রাণ যে-রকম ভয় আর নিরাশায় পূর্ণ ছিল, এখন তেমনই আশায় আর আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ল। শীঘ্রই যে তাঁদের মনো-

বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, এ বিষয়ে তাঁদের আর কোনও সন্দেহ রইল না।

রাজারাণী দেশে ফিরতেই ঘরে ঘরে উৎসব সুরু হয়ে গেল। প্রজারা একেবারে শোকে নিরাশায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, মল্লদেব আর বিজয়াকে ফিরে পাবার আশা আর তাদের ছিল না। এখন রাজপ্রাসাদেও মহোৎসবের স্রোত বইতে লাগল। দান-ধ্যান, কাঙ্গালীভোজন— নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধন মল্লদেব দুহাতে বিলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

বিশাল রাজকোষ ক্রমে শূন্য হয়ে এল, কিন্তু মন্দির থেকে তাঁরা যে দুটি ফল নিয়ে এসেছিলেন, তা যেমন শুকনো তেমনই রইল। বিজয়া দুঃখিত হয়ে বল্‌লেন, "আর আমাদের কি আছে যে দেব ? এততেও দেবতা সন্তুষ্ট হলেন না ?"

মল্লদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখা যাক্, একেবারে সর্ব্বস্ব দিয়েও দেবতাকে তুষ্ট করা যায় কিনা। সামনের পূর্ণিমায় আমরা প্রাসাদের দ্বার

সাধারণের কাছে খুলে দেব। সেদিন আমাদের অদেয় কিছুই থাকবেনা। প্রাণও যদি কেউ চায়, তাও দিয়ে দেব। আশা করি, এইবার ভৈরব তুষ্ট হবেন।"

রাণী তাতেই রাজী হলেন। রাজ্যে তাঁদের কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছড়িয়ে পড়ল। সকলে উৎসুক হয়ে কবে পূর্ণিমা আসে, তারই দিন গুণতে লাগল।

পূর্ণিমা এসে পড়ল। মল্লদেবের নিজের রাজ্যের শুধু নয়, আশে পাশের রাজ্যের যত দীন দুঃখী প্রার্থীর দল এসে ভীড় করে দাঁড়াল। রাজা রাণী প্রাসাদের দরজা খুলে দিলেন, সবাইকে ডেকে বল্‌লেন, "যার যা নেবার ইচ্ছে, নিয়ে যাও; আজ আমাদের অদেয় কিছু নেই।"

ভিখারীর দল স্রোতের জলের মত প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পড়ল, দুহাত ভ'রে ধনরত্ন নিয়ে যেতে লাগল, যাবার সময় প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতে লাগ্‌ল রাজারাণীকে। ক্রমে ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল, রাণীর বহুমূল্য অলঙ্কার, প্রাসাদের সুন্দর

গৃহসজ্জাগুলিও এক এক ক'রে অন্তর্হিত হ'ল। রাজারাণী চেয়ে দেখলেন, তখনও দু'জন মানুষ ব'সে আছে,—আর সকলের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, তারা চ'লে গিয়েছে।

রাণী বৃদ্ধা ভিখারিণীকে ডেকে বল্‌লেন, "তুমি কি চাও বাছা? আমাদের আর কিছু ত দেবার নেই!" বুড়ী নিজের বীভৎস ক্ষত-চিহ্নিত মুখ তুলে বল্‌লে, "রাণীমা, আমার রূপ নেই, তার দুঃখে আমি বড় কাতর। দেশের লোকে আমায় ঘেন্না করে। তাই আপনার দেবী-প্রতিমার মত যে রূপ, তাই আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।"

রাজারাণী বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর রাণী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন, "তাই হোক্। কিন্তু রূপ কি ক'রে দেব বাছা? এ কি দেবার জিনিষ?"

বুড়ী খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁর কাছে এসে বল্‌লে, "আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলুন, 'আমার রূপ তোমার দেহে যাক, তোমার কুরূপ আমার দেহে আসুক'—তাহলেই হবে।"

রাণী অকম্পিত-হাতে বুড়ীর গায়ে হাত বুলিয়ে কথাগুলি ব'লে গেলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভিখারিণীর কদর্য্যরূপ ঘুচে গেল। বিজয়ার অপূর্ব্ব-রূপরাশি তার অঙ্গে ফুটে উঠ্‌ল, তার জরা আর কুরূপ বিজয়ার দেহে আশ্রয় নিল। ভিখারিণী হাস্‌তে হাস্‌তে আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে গেল।

তখন ভিখারী উঠে বল্‌লে, "মহারাজ, আমি অক্ষম বলহীন। মানুষের সমাজে আমি হেয়। আপনার বল আর বীর্য্য আমি প্রার্থনা করি। আপনিও রাণীর মত ক'রে বল-বীর্য্য আমায় দান করুন।"

মল্লদেব বল্‌লেন, "তাই হোক।" ভিখারীর সর্ব্বাঙ্গে তিনি হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর অসাধারণ বল-বীর্য্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ ক'রে গেল। কুরূপ এবং হীনবল হয়ে রাজারাণী প্রাসাদের ভিতর ফিরে চ'লে গেলেন।

প্রাসাদের প্রকাণ্ড ঘরগুলো সব শূন্য খাঁ খাঁ কর্‌ছে। কোথাও কিছু নেই। শুধু রাণীর পূজার ঘরে সেই ভৈরবের মন্দির থেকে আনা ফল দু'টি

প’ড়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফল দু’টি ত আর শুকনো নেই? রসে রঙে সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে, সবে যেন বৃক্ষ-জননীর ক্রোড়চ্যুত হয়ে খ’সে পড়েছে।

রাণী বল্‌লেন, “আমাদের শেষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তবে দেবতাকে আমরা তুষ্ট করতে পেরেছি”—ব’লে ফলটি তুলে নিয়ে তিনি আহার করলেন। রাজাও তাই করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে প্রচার হয়ে গেল যে প্রাসাদে রাজশিশুর আবির্ভাব হবে। প্রজাদের ঘরে আনন্দকোলাহল বেধে গেল।
রূপ- ও শক্তি-হীন হয়ে পড়ায় রাজ্যে যে দুঃখের আঁধার নেমে এসেছিল, তাও যেন হঠাৎ লুপ্ত হয়ে গেল।

ভোরের আলো সবে যখন রাত্রির অন্ধকারকে পৃথিবীর সীমানা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, সেই সময় জন্ম নিলেন রাজকুমার তিমির-বরণ। তাঁর গায়ের রঙ্‌ শাণিত ইস্পাতের মত, তাই তাঁর এ নাম হল।

রাজা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েই অবাক্ হয়ে গেলেন। কোথায় গেল তাঁর দুর্ব্বলতা আর অক্ষমতা? আগেকার সেই অমানুষিক বল-বীর্য্য এক নিমেষেই যেন তাঁর দেহে মনে ফিরে এল।

আবার সূতিকাঘরের দরজায় শাঁখ বেজে উঠল। রাজকুমারী জ্যোতির্লতা জন্ম নিয়েছেন, আর তাঁকে কোলে নিয়ে রাণী বিজয়া আনন্দে আর ফিরে পাওয়া রূপের প্রভায় শুক্লা পূর্ণিমার মত শোভা পাচ্ছেন।

অতি লোভ

(বিদেশী গল্প)

এক পাড়াগাঁয়ে পাশাপাশি দুই-ঘর গৃহস্থ বাস করে। একজন তাঁতি, সে বেচারা গরীব মানুষ, অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে দিন কাটায়। আর একজন মুদী, তার অবস্থা বেশ ভাল, ঘরে কিন্তু ছেলে-পিলে নেই। মুদী বড় কৃপণ, গরীব-দুঃখীকে এক-পয়সা দিতে কখনও তার হাত ওঠে না। তাঁতি যদিও তার তুলনায় অত্যন্ত গরীব, তবু তার মনটা ভাল, পারতপক্ষে তার দরজা থেকে গরীব-দুঃখী কখনও ফিরে যায় না।

পৌষ-পার্ব্বণের আগের রাত্রে মুদী-গিন্নি দরজায় খিল দিয়ে ব'সে ভাল ভাল পিঠে তৈরী করছে। দরজা বন্ধ করবার কারণ, যদি আশে-পাশের গরীব ছেলে-পিলে দেখতে পেয়ে দু-একখানা চেয়ে বসে? তাহ'লেই ত মুদী-গিন্নির সর্ব্বনাশ!

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

পাটিসাপ্‌টার থালাটি বেশ ভর্ত্তি ক'রে মুদী-গিন্নি সবে উঠ্‌বে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়্‌ল,—ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌।

মুদী-গিন্নি চ'টে, তাড়াতাড়ি পিঠের থালার উপর একটা ধামা চাপা দিয়ে, দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারল। দেখে খুন্‌খুনে এক বুড়ী, গায়ে সাতভালি দেওয়া ময়লা কাঁথা, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে কাঁপ্‌ছে।

মুদী-গিন্নি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে, "তুই কি চাস্‌ রে? এখানে মর্‌তে এসেছিস্‌ কেন?"

বুড়ী বল্‌লে, "সারাদিন কিছু খাইনি মা, রাতে বুড়ো-মানুষ চোখে দেখতে পাই না, আমাকে একটু জায়গা দেবে? শীতে হাড়-গোড় জ'মে গেল।'

মুদী-গিন্নি বল্‌লে, "বেরো, বেরো, আমার আর কাজ নেই, রাজ্যের যত ভিখিরীকে ঘরে জায়গা দেব। যা না ঐ তাঁতির বাড়ী, তাদের সুখ্যাত মানুষে পাঁচ মুখে করে, সে তোকে জায়গা দেবে এখন"—ব'লেই দড়াম্‌ ক'রে বুড়ীর মুখের উপর

দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, পিঠের থালা নিয়ে ঘরে গিয়ে বস্‌ল।

বুড়ী শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চল্‌ল তাঁতির বাড়ী। তাঁতিনীও তখন চারটি চাল-গুঁড়ো দিয়ে, ছেলে-ভুলনো খান-কতক পিঠে কর্‌তে বসেছে। নইলে বোকা ছেলে-মেয়েরা ছাড়ে না যে? মা-বাবার নেই বল্‌লে ত তারা শুন্‌বে না! কাজেই যেমন ক'রে হোক তাদের ভুলাতে হবে। তাই চাল-গুঁড়ো আর গুড় দিয়ে তাঁতি-বৌ পিঠে কর্‌ছে। ছেলে মেয়েরা পাশে ব'সে দেখ্‌ছে।

এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল—ঠক্-ঠক্-ঠক্। তাঁতি-বৌ পিঠের কড়া নামিয়ে রেখে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দেখে খুন্‌খুনে এক বুড়ী দাঁড়িয়ে, শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

দেখেই তাঁতিনীর দয়া হল, সে জিগ্‌গেষ কর্‌লে, "কি চাও গা বাছা তুমি?"

বুড়ী বল্‌লে, "আমি ছুদিন খাইনি মা, বুড়ো-মানুষ রাতে চোখে দেখি না, আমাকে একটু জায়গা দেবে?"

তাঁতিনী বল্লে, "তা এস বাছা, আমাদের যদিও একখানা মোটে ঘর, তবু এমন শীতের রাতে তোমাকে ত ফিরিয়ে দিতে পারি না। যা হোক দুমুঠো খেয়ে এইখানেই শুয়ে থাক।"

বুড়ী ভেতরে এসে দাঁড়াল। তাঁতিনী ভাঙা থালায় ক'রে খান-কয়েক পিঠে এনে তাকে খেতে দিল। ছেলে-মেয়েরাও তার চারধার ঘিরে পিঠে খেতে বসল। খাওয়া হয়ে গেলে সবাই সেই এক ঘরে ছেঁড়া মাদুর, কাঁথা, যে যা পেল, তাই পেতে শুয়ে পড়ল। বুড়ীও তাদের সঙ্গে শুল।

ভোর রাত্রে বুড়ী উঠে পড়্ল। তাঁতিনীকে জাগিয়ে বল্লে, "মা আমি চললাম, তুমি ঘরে দোর দিয়ে শোও। তোমার মনটা বড় ভাল, তাই যাবার সময় বুড়ো মানুষ আমি তোমায় আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি। একটা কোনো ইচ্ছা কর, সে ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে।"

তাঁতি-বৌ ভেবেই পেলে না কি ইচ্ছা কর্‌বে। অনেকক্ষণ পরে তার মনে পড়্‌ল যে আগের দিন তার স্বামী খুব একখানা বাহারের শাড়ী বুনছে

আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সূতোর অভাবে বেশীক্ষণ বুনতে পারেনি। সকালবেলা একটুক্ষণ কাজ ক'রে, সারাদিন তাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল। তাই সে বল্‌লে, "আচ্ছা মা, আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের ঘরে সকালবেলা যে কাজ আরম্ভ হবে, তা যেন সারাদিন চল্‌তে থাকে।"

বুড়ী বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই হবে,"—ব'লে লাঠি ঠক্‌ঠক্ কর্‌তে কর্‌তে ভোরের কুয়াসার মধ্যে মিশিয়ে গেল।

সকাল বেলা উঠে তাঁতি গিয়ে তাঁতে বস্‌ল। ধার ক'রে অল্প একটু সুতো এনেছে যদি কাপড়খানা শেষ কর্‌তে পারে। তাঁতে হাত দিতেই তাঁত এমন জোরে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, যেন তার প্রাণ হয়েছে। কাপড়খানা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তাঁত আর থাম্‌বার নামও করে না। সেটা চলেছে খটাখট্, কাপড়ের পর কাপড় বোনা হয়ে চলেছে, আর প্রত্যেকটা আলাদা রকমের। তাঁতি ত একেবারে হতভম্ব, কি ব্যাপার বুঝ্‌তেই পারে না। অথচ তাঁতের সামনে থেকে উঠ্‌তেও পারে না।

কাপড়ের পর কাপড় বেরচ্ছে, আর ঘরের কোণে জমা হচ্ছে। এমন নানা রং-এর এত সুন্দর সুন্দর কাপড় কেউ এ গাঁয়ে চোখেও দেখেনি। তাঁতি-বৌ আর ছেলে-মেয়েরা চারদিকে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে, এমন কাণ্ড তারা জন্মে দেখেনি।

শেষে ঘরে আর কাপড় ধরে না, দরজা দিয়ে কাপড় বেরিয়ে উঠানে পড়তে আরম্ভ কর্‌ল। শেষে উঠানও ভ'রে গেল। তখন গ্রামের লোক খবর পেয়ে ভীড় ক'রে এসে দাঁড়াল, তারাও ত কাণ্ড দে'খে অবাক্।

রাত্রি পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চল্‌ল, তারপর তাঁতটা নিজে থেকেই থেমে গেল। কাপড়ের গল্প মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর কাছেই যে সহর ছিল, সেখান থেকে কাপড়ের ব্যাপারীরা এসে সব কাপড় বেশ ভাল দামে কিনে নিয়ে গেল। তাঁতির দুঃখ চিরদিনের মত ঘুচে গেল, ছেলে-পিলে নিয়ে সে সুখে ঘরকন্না কর্‌তে লাগল।

এদিকে সেই মুদী-বৌ ত ব্যাপার দে'খে কপাল চাপ্‌ড়ে মরে আর কি? সে থাকতে লক্ষ্মীছাড়ী

তাঁতি-বৌ কিনা এই রকম জিতে গেল ? বুড়ীটা ত প্রথম মুদী-বৌএর ঘরেই এসেছিল, সে যদি বোকামী ক'রে তাকে তাড়িয়ে না দিত, তা হলে তার ঐশ্বর্য্য আজ খায় কে ? মুদী তার দুঃখ দে'খে সান্ত্বনা দিতে লাগল, "অত দুঃখ ক'রে লাভ কি ? যা হবার তাত হয়েই গেছে ? আস্‌চে বছর পিঠে-পার্ব্বণের দিনে আবার সে আস্‌বে হয়ত, তখন একটু সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা কোয়ো।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বছর ঘুরে এল। আবার পিঠে-পার্ব্বণের আগের রাতে মুদী-বৌ ব'সে পিঠে করছে, তার কান প'ড়ে আছে দরজার দিকে, কখন কে এসে দরজায় ঘা দেয়। সত্যি খানিক পিঠে হয়ে যাবার পরেই দরজায় ঘা পড়ল—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

মুদী-বৌ তাড়াতাড়িতে প্রায় পিঠের থালা উল্টে ফেলে ছুট্‌ল দরজা খুলতে। দেখে কাঁথা মুড়ি দিয়ে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে, শাদা দাড়ি তার পা অবধি লুটিয়ে পড়ছে।

মুদী-বৌ খুব মিষ্টি ক'রে জিগ্‌গেষ করলে, "হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কি চাও ?"

বুড়ো বল্‌লে, "দু-তিন দিন কিছু খাইনি মা, আমাকে কিছু খেতে দেবে ?"

মুদী-বৌ মহা খাতির ক'রে বুড়োকে বললে, "এস, এস, ভেতরে এস। দেব বৈকি খেতে, না হলে গেরস্তর ঘর আছে কি কর্‌তে ?"

বুড়ো মহা আরামে আগুনের ধারে ব'সে পিঠে খেতে লাগল। মুদীও এসে পড়ল, দুজনের আদর-যত্নের ঘটা দেখে কে ? বুড়ো খেয়ে দেয়ে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু তারা তাকে জোর ক'রেই ধ'রে রাখ্‌ল। সব চেয়ে ভাল ঘরে, ভাল বিছানা পেতে তারা বুড়োকে শুইয়ে রাখ্‌ল।

ভোর রাত্রে বুড়ো উঠে মুদীর ঘরের দরজা ঠেল্‌তে লাগ্‌ল। মুদী আর তার বৌ দুজনেই জেগে ছিল, ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে বেরিয়ে এল। বুড়ো বললে, "দেখ বাছা, আমি চললাম, আমার অনেক দূরের পথ যেতে হবে। তা তোমরা আমায় খুব আদর যত্ন করেছ, তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি। একটা কিছু ইচ্ছা কর, সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

মুদী কিছু বল্‌বার আগেই মুদী-বৌ ব'লে উঠ্‌ল,

মুদী-বৌ কাঁচি দিয়ে কাপড় কেটেই চলেছে, কেটেই চলেছে

"আমরা সকালে যে কাজ আরম্ভ করব, সারাদিন যেন সে কাজ চলতে থাকে।"

বুড়ো ব'ল্‌লে, "আচ্ছা,"—ব'লে দরজা খুলে বেরিয়ে চ'লে গেল্।

মুদী বল্‌লে, "আচ্ছা কি কাজ আরম্ভ করা যায়, বল দেখি?"

মুদী-বৌ বল্‌লে, "আমি সে সব ঠিক ক'রে রেখেছি। আমরা সকাল থেকে টাকা গুণব। দাঁড়াও ঐ চট ক'টা কেটে গোটা-কয়েক থলি তৈরী ক'রে রাখি, না হলে অত টাকা ধর্‌বে কিসে?"

এই ব'লে সে কাঁচি নিয়ে ব্যস্ত-ভাবে চট কাট্‌তে আরম্ভ ক'রল্। মুদী আবার ফিরে গিয়ে বিছানায় শুল এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। মুদী-বৌ এত ব্যস্ত হয়ে চট কাট্‌ছে যে কখন সূর্য্য উঠে সকাল হয়ে গেছে, তা সে টেরও পায়নি।

হঠাৎ মুদী ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "আরে আরে করছিস্ কি? সকাল যে হয়ে গেছে? টাকা গুণতে আরম্ভ কর্‌বি কখন?"

আর তখন কে টাকা গোণে? মুদী-বৌ কাঁচি

দিয়ে কাপড় কেটেই চলেছে, কেটেই চলেছে। চট কখন শেষ হয়ে গেছে, সে এখন নিজের শাড়ী-গুলো কচাকচ্ ক'রে কাট্‌ছে। তারপর মুদীর কাপড়, তারপর বিছানা, বালিশ, তোষক, লেপ, কম্বল, পরদা—সব একে একে কেটে শেষ কর্‌তে লাগ্‌ল। কেউ আর কিছুতেই তাকে থামাতে পারে না। ঘর-দোরের সব জিনিষ যখন নির্ম্মূল হয়ে গেল, তখন সূর্য্য ডুবে অন্ধকার হয়ে গেছে। মুদী-বৌয়ের হাতের কাঁচি তখন থামল। গাদা করা কাটা কাপড়ের মধ্যে ব'সে তারা স্বামী-স্ত্রীতে মাথা চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

কুঁড়ে শামুক

(বিদেশী গল্প)

এক গাঁয়ে এক পেটুক ছিল, তার নাম শ্যাম। গাঁয়ের লোকে তাকে শামু ব'লে ডাকত। শামু নামটা শেষে শামুক হয়ে দাঁড়াল, কারণ পেটুকটা হাঁটত অত্যন্ত আস্তে আস্তে।

শামুকই যে একলা পেটুক ছিল তা নয়, তার বৌটিও খুব খেতে ভালবাসত, তবে সব জিনিষে তার রুচি ছিল না। ঝাল-চচ্চড়ি খেতে পেলে সে বেজায় খুসি। শামুক ত বেজায় কুঁড়ে, তাকে দিয়ে খাওয়া ছাড়া কোনও কাজই হয় না, সুতরাং রোজ রোজ ভাল জিনিষ খেতে তারা পাবে কোথায়? শামুকের বৌ সারা সপ্তাহ সুতো কাটে, শামুক সেই সুতো হাটের দিন হাটে নিয়ে যায়, তা বিক্রী ক'রে যা পায়, তাতেই তাদের সাতদিন চলে। ·হাট থেকে পয়সা নিয়ে ফিরবার পথে, শামু আর কিছু কিনুক আর নাই কিনুক, ঝাল-চচ্চড়ি

রাঁধ্‌বার তরকারিটা ঠিক নিয়ে যায়, নইলে স্ত্রীর হাতে আর রক্ষা থাকবে না।

একদিন হাটে সুতোগুলো বেশ চড়া দামে বিক্রী হ'ল। শামু মহা খুসি, ভাবলে পথে যেতে যেতে কোনও একটা মিঠাইয়ের দোকানে কিছু মিঠাই খেয়ে যাওয়া যাবে। হাতে ত পয়সা আছে, বৌ-এর চচ্চড়ির তরকারি কিনেও কিছু বাকি থাকবে। বাড়ী ফিরবার পথেই বেশ বড় একটা ময়রার দোকান, শামু সোজা গিয়ে তার ভিতর ঢুক্‌ল। একবার খেতে আরম্ভ ক'রেই সে দুনিয়ার সব কথা ভুলে গেল। ক্রমাগত খেয়েই চল্‌ল, চারদিকে যত সুন্দর সুন্দর খাবার দেখে, তত তার ক্ষিদে বেড়ে যায়।

শেষে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে দেখে ময়রা বললে, "কি হে শামুক, একটানা খেয়ে চলেছ যে? পয়সা আছে ত ট্যাঁকে?"

শামু দাম দেবার জন্যে ট্যাঁক থেকে পয়সাগুলি বার করল। কিন্তু দাম চুকিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, প্রায় সবই শেষ হয়ে গেল, বাকি মাত্র ছ'টা

পয়সা। সে খেয়েছে কি কম? ময়রা পয়সা গুণে নিয়ে বল্লে, "এইবার কেটে পড় বাপধন, রাত হয়ে এসেছে।"

শামু বাইরে বেরিয়ে এল। তার মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে। মাত্র ত ছ'টা পয়সা হাতে, সারা সপ্তাহ খাবে কি দিয়ে? বৌ-এর জন্যে যদি ঝাল-চচ্চড়ির তরকারিও নিয়ে যেতে পারত ত বৌ না-হয় একটু ভাল মেজাজে থাকৃত। এখন শামু ছ'পয়সা নিয়ে ঘরে ঢুকলেই ত সে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে।

খানিক দূর এগিয়ে শামু দেখ্ল, রাস্তার ধারে আরো একটা ছোট মিঠাইয়ের দোকান। এত যে খেয়েছে, তবু শামুর লোভ যায়নি। সে ভাব্লে এ ছ'টা পয়সা থাক্লেই কি আর গেলেই কি; বৌ-এর কাছে সমানই বকুনি খাব। তার চেয়ে আরও গোটা-কয়েক মিঠাই খেয়ে নিই। যেমন ভাবা, তেমনই দোকানে ঢোকা। দেখ্তে দেখ্তে সেই ছ'টি পয়সাও দোকানীর পকেটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শামুর তখন সত্যি সত্যি ভাবনা হ'ল। এখন সে বাড়ী ফিরবে কোন্ মুখে? স্ত্রীর মূর্ত্তি মনে ক'রে তার বেজায় ভয় করতে লাগল। শেষকালে কি মার খেয়ে মরবে? দোকানের বাইরে একটা গাছতলায় ব'সে, সে ক্রমাগতই ভেবে চলল, কি ক'রে আবার কিছু পয়সা রোজগার করা যায়। পয়সা না নিয়ে যে ফেরা যাবে না, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। ভাবতে ভাবতে গাছ-তলাতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর বেলা ময়রা যখন দোকান খুল্ছে, তখনও শামুকে দে'খে অবাক্ হয়ে গেল। বল্লে, "কিহে শামুক, সত্যিই শামুক হয়েছ নাকি? সারারাত ধরে ঐ টুকু গিয়েছ?"

শামু বল্লে, "আমি বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই, কিছু পয়সা না নিয়ে যদি বাড়ী যাই, তা হলে মার খেয়ে মরব। কি ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করা যায় বল্তে পার?"

দোকানী বল্লে, "এক কাজ কর, পাশের গাঁয়ের জমিদার-গিন্নীর একটা হীরার আংটি হারিয়ে

গেছে, কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। তারা বলেছে, যে সেই আংটি খুঁজে দেবে তাকেই তারা একশ' টাকা দেবে। তুমি গিয়ে আংটিটা খুঁজে দেখ না, যদি কপাল-গুণে পেয়ে যাও ত কোনো ভাবনাই থাকে না।"

শামু ভাব্‌লে, "মন্দ নয় ত, একটু খুঁজে দেখাই যাক্ না, যদিই পেয়ে যাই,"—এই ভেবে সে গুটি গুটি পাশের গাঁয়ের রাস্তা ধর্‌ল।

জমিদার-বাড়ী পোঁছে সে বল্‌লে যে সে একজন মস্ত যাদুকর, মন্ত্রের বলে সে যা খুসি তাই কর্‌তে পারে। জমিদার বা তাঁর গিন্নী যে শামুর কথা বিশেষ বিশ্বাস করলেন তা নয়, তবু চেষ্টা কর্‌তে ত ক্ষতি নেই। তাই জমিদার-গিন্নী বল্‌লেন, "বেশ ত খুঁজে দেখ না? মন্ত্রের জোরে যদি আংটিটা বার করতে পার, একশ' কেন, তোমায় দেড়শ' টাকা দেব। কিন্তু তিন দিনের ভেতর না যদি পার, তাহলে তোমায় মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদায় ক'রে দেব।"

শামু ত আদাজল খেয়ে আংটি খুঁজতে লেগে

গেল। প্রথমে সে স্থরু করল বাগানটা খুঁজতে,—প্রত্যেক গাছতলা, গর্ত্ত, পাতার গাদা সব উল্টে-পাল্টে কতবার যে সে দেখ্‌ল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পিঁপড়ের গর্ত্তগুলি শুদ্ধ সে মাটিতে উপুড় হয়ে প'ড়ে খুঁজে দেখল।

শামু ত বাগান খুঁজছে, এমন সময়ে দেখল যে বাগানের এক কোণে জমিদার বাড়ীর তিনটে চাকর দাঁড়িয়ে কি সব ফিস্ ফিস্ করে বলাবলি করছে। শামুর তাদের দে'খে লজ্জাও হ'ল, রাগও হ'ল; সে ভাবলে, "আমি কি রকম শুধু শুধু হয়রান হচ্ছি তাই দেখবার জন্যে বেটারা দাঁড়িয়ে আছে।" এই না মনে ক'রে, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকাতে তাকাতে সেখান ছেড়ে চ'লে গেল।

সে চ'লে যেতেই চাকরদের ভিতর একজন আর একজনকে বল্‌লে, "আরে এটা সত্যিই যাদু জানে নাকি? আমাদের দিকে কি রকম ক'রে তাকাচ্ছে দেখ? কে আংটি নিয়েছে সত্যিই বুঝতে পেরেছে নাকি?"

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর জমিদার-গিন্নী শামুকে ডেকে বল্‌লেন, "কি, তুমি খোঁজ পেলে কিছু ?"

শামু বল্‌লে, "এখনও পাইনি।"

জমিদার-গিন্নী বিরক্ত হয়ে একটা চাকরকে ডেকে বল্‌লেন, "একে শোবার জায়গা দেখিয়ে দাও গিয়ে।"

চাকরটা চল্‌ল তার সঙ্গে। শোবার ঘরে গিয়েই শামু ধপ্‌ করে বিছানায় ব'সে পড়ল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে, "হায়, হায়, তিনটের একটা ত গেল !" অর্থাৎ তিন দিনের একটা দিন চ'লে গেল।

চাকরটা ঠিক সেই সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে শামুর কথা শুনে বেজায় ভড়কে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। নিজের সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বল্‌ল, "ও ভাই সর্ব্বনাশ হয়েছে, লক্ষীছাড়া যাদুকরটা সব জেনে ফেলেছে। আমায় দেখে বল্‌লে কিনা, 'হায়, হায়, তিনটের একটা ত গেল।' "

এই তিনজন চাকর মিলেই গিন্নীর আংটিটা চুরি করেছিল। কাজেই তারা এখন থেকে খুব সাবধান হয়ে শামুর চলা-ফেরা লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌ল।

দ্বিতীয় দিন শামু জমিদার বাড়ীর আনাচ্‌ কানাচ্‌ ঘর দোর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, ঘোড়ার আস্তাবল সব খুঁজে দেখল। কিন্তু আংটি কোথাও পাওয়া গেল না। সেদিনও জমিদার-গিন্নী শামুকে ডেকে আংটির খবর নিলেন, তারপর একটা চাকরকে ডেকে তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিতে বল্‌লেন। শামুর মনটা আজকে আরো খারাপ ছিল, কারণ দু'টো দিনই বৃথায় চলে গেল, আর একদিন মাত্র বাকি। এরপর তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হবে। সে খাটে ব'সেই বললে, "হায় রে কপাল, আর একটাও ত চল্‌ল।"

দ্বিতীয় চাকরটা এই কথা শুনবামাত্র প্রাণপণে ছুট্‌ দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললে, "ভাই রে, আমাদের হয়ে এসেছে। ও সবই জানতে পেরেছে, কালই বোধ হয় গিন্নীমাকে ব'লে দেবে। আমাদের কি হবে?"

অনেকক্ষণ পরামর্শ করে তারা ঠিক কর্‌ল যে শামুকে সব খুলেই বলা হবে। তাকে অনুনয় বিনয় ক'রে দেখতে হবে যাতে সে জমিদার-গিন্নীকে কিছু না বলে। চাকররা চুরি-টুরি ক'রে যে টাকা জমিয়েছে, তার থেকেও খানিকটা শামুকে দেওয়া হবে ব'লে তারা স্থির কর্‌ল।

তারপর দিন টাকাকড়ি দিয়ে শামুকে খানিক ঠাণ্ডা ক'রে, তারা আস্তে আস্তে হীরার আংটিটা বার ক'রে শামুর হাতে দিল। অনেক ক'রে তার হাতে পায়ে ধ'রে ব'লে দিল যে তাদের নাম যেন কারও কাছে বলা না হয়।

শামু খুব গম্ভীর মুখ ক'রে বল্‌লে, "দেখলে ত বাবা, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আচ্ছা, তোমরা যখন এত ক'রে বল্‌ছ, তখন এবার আর আমি কথাটা ফাঁশ কর্‌বা না, কিন্তু ফের যদি এমন কর্ম্ম কর ত দেখ্‌তে পাবে।"

শামু তারপর ভাবতে বস্‌ল কি উপায়ে আংটিটা ফেরৎ দেওয়া যায়। সোজাসুজি দিতে গেলে নিজেকেই মুস্কিলে পড়তে হবে, কোথায়

পেল, কি বৃত্তান্ত, সব গুছিয়ে বলা শক্ত হবে। তার চেয়ে একটা ফন্দী করা যাক্।

সে এক দলা ভাতের ভিতর আংটিটা লুকিয়ে পুকুর ধারে চল্‌ল। এক পাল হাঁস পুকুর পাড়ের কাদায় ঘোরা-ঘুরি কর্‌ছিল। তাদের একটার সামনে ভাতের দলাটা ফেল্‌বামাত্র সে সেটা টপ্ ক'রে গলে নিল।

ঘণ্টা-খানিক পরে শামু গিয়ে জমিদার-গিন্নীর কাছে হাজির। বল্‌লে, "গিন্নীমা, আপনি অনর্থক চাকরবাকরদের সন্দেহ কর্‌ছিলেন। আসল চোর যে সে ধরা পড়েছে।"

জমিদার-গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "কৈ, কোথায় সে ?"

শামু গিয়ে হাঁসটাকে ধ'রে নিয়ে এসে বল্‌লে "এর পেটে পাবেন, আমি মন্ত্র-বলে জান্‌তে পেরেছি।"

হাঁসটা মারবার পর যখন সত্যি সত্যিই তার পেট থেকে আংটিটা বেরল, তখন শামুর খাতির দেখে কে ?

কিন্তু শামু বেচারার অদৃষ্টে তখনও ভোগ ছিল। জমিদার-গিন্নীর ধারণা হ'ল যে শামু নিশ্চয়ই একটা কিছু ফন্দী খাটিয়েছে, আসলে মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই সে জানে না। তাকে আর একবার পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে তিনি বল্‌লেন, "আমি তোমার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমাদের আর একটা কিছু দেখাও।"

শামুর মাথায় ত আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কি আর করে, মুখে বল্‌লে, "যে আজ্ঞে, আপনি যা দেখাতে বল্‌বেন, তাই দেখাব।"

জমিদার-গিন্নী উঠে নিজের ঘরে গেলেন, তারপর খানিক বাদে শামুকে ডেকে পাঠালেন। শামু গিয়ে দেখে, তিনি একখানা রেকাবীর উপর আর একখানা রেকাবী চাপা দিয়ে রেখেছেন। আর ঘর ভর্ত্তি লোক হাঁ করে সেটার দিকে চেয়ে আছে।

শামু যেতেই জমিদার-গিন্নী বল্‌লেন, "দেখ, তোমায় বলতে হবে এই রেকাবী-দুটোর মাঝখানে কি আছে। যদি ঠিক বল্‌তে পার, তাহলে দেড়

শ’ টাকার উপরে আরো পঞ্চাশ টাকা তোমায় দেওয়া হবে, আর যদি না পার, তাহলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তোমাকে এখান থেকে বার ক’রে দেওয়া হবে।”

শামু ত মহা ফাঁফরে পড়ল। সে খানিকক্ষণ একেবারে চুপ ক’রে ব’সে রইল। কত কিছু যে ভাব্‌ল তার ঠিক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌তে সাহস করল না। একবার যদি ভুল বলে, তাহ’লে আর সে ভুল শোধরাবার স্থযোগ পাবে না।

একবার ভাবল, প্রাণপণে চোঁ চাঁ দৌড় দেবে, কিন্তু বাড়ী গেলেও ত ঝাঁটা খেতে হবে! কি যে করা যায়?

অবশেষে হতাশ হয়ে সে ব’লে উঠ্‌ল, “হায় রে শামুক, তোর দশা কি হল।”

জমিদার-গিন্নী তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়ে ব’লে উঠ্‌লেন, “কি আশ্চর্য্য! তোমার ক্ষমতা সত্যিই অসাধারণ।” রেকাবীটা তুলবামাত্র দেখা গেল, তার ভিতর একটা শামুক ম’রে প’ড়ে রয়েছে।

তখন আর শামুকে পায় কে? জমিদার-গিন্নীর

কাছে দু'শ টাকা নিয়ে সে ত নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ী চ'লে গেল।

তারপর তার বৌ দিনে পাঁচবার করে ঝাল চচ্চড়ি খেতে লাগ্‌ল, আর শামু মিঠাই খেয়ে খেয়ে প্রায় অসুখ বাধিয়ে বসবার জোগাড়।

পেটুক ভজু

বাংলাদেশের এক গৃহস্থের ঘরে একটিও ছেলে নেই। তার গোলা ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, বাগানভরা ফল, তরকারি। কিন্তু খাবার লোকই নেই। গৃহস্থ আর তার বউ, কতই আর খাবে? মনের দুঃখে তারা কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ নদীর জলে ঢেলে দেয়। রাশি রাশি ফল পাড়ার ছেলে-মেয়েদের বিলিয়ে দেয়। তারপর খালি মাথা চাপড়ায় আর কাঁদে, "একটা যেমন তেমন বোকা হাবা ছেলেও যদি হ'ত। ঘরে বসে ঘরের জিনিষ খেত, দুটো চোখ একটু জুড়োত।"

মানুষ যা চায়, ভগবান্ কখনও কখনও তাকে ঠিক তাই দিয়ে বসেন। এতকাল ছেলে-পিলে কিছুই ছিল না, হঠাৎ গৃহস্থের বউয়ের এক ছেলে হ'ল। আনন্দে তারা ত একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল, ছেলে নিয়ে কি যে করবে কিছু ভেবে পায় না।

কিন্তু এ আনন্দ তাদের বেশী দিন রইল না। ছেলে ত নয়, ঠিক রাক্ষস। এমন ভয়ানক সে খেতে লাগল যে তার বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন সব বিষম ভড়্কে গেল। হাঁটতে শিখবার আগেই তাদের ছেলে ভজু হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বড় এক এক কড়া দুধ চুমুক দিয়ে শেষ ক'রে রাখত। প্রথম দিন কেউ বিশ্বাস কর্‌ল না, বাড়ীর হুলো বেরালটা শুধু শুধু মার খেয়ে মর্‌ল।

কিন্তু একদিন গৃহস্থ রান্নাঘরের জান্‌লার পাশে লুকিয়ে রইল। ভজুর মা ভাঁড়ার ঘরে ব'সে তরকারি কুটছে, ভজু হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছে, মাঝের দরজাটা খোলা। মা অন্যমনস্ক হয়ে আলু ছাড়িয়ে যাচ্ছে, খোকা কখন হামা দিতে দিতে টুক্ ক'রে চৌকাট পার হয়ে গেল। কড়াভরা দুধ জ্বাল দেওয়া রয়েছে, তার পাশে গিয়ে চুমুক দিতে লাগ্‌ল। চোঁ চোঁ চোঁ—কড়া প্রায় খালি হয়ে এসেছে, এমন সময় ভজুর বাবা ছুটে এসে ছেলের পিঠে এক চড় বসিয়ে দিল।

ছেলে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠতেই, তার মা বঁটি

ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে রান্নাঘর ছুটে এল। স্বামীকে তাড়া দিয়ে বল্‌লে, "তুমি কি ক্ষেপেছ? এইটুকু ছেলেকে ধ'রে মারছ কেন?"

ভজুর বাবা বল্‌লে, "আমি ত মাত্র একটা চড় মেরেছি, এর পর দেশশুদ্ধ লোক ওকে বাঁশ-পেটা করবে। এখনই এক কড়া দুধ শেষ কর্‌ল, এরপর ও মানুষ ধ'রে খাবে। ওকি মানুষ, ও রাক্ষস।"

ভজুর মা ছেলেকে কোলে নিয়ে বকতে বকতে চ'লে গেল। একটা ত মোটে ছেলে, না-হয় এক কড়া দুধই খেয়েছে। আগে ত দুধ জলে ফেলে দেওয়া হত। ঘরের ছেলে খেলে ত খুসী হওয়ারই কথা!

কিন্তু ভজু বেচারার অদৃষ্টে এত আদর সইল না। সে চার বছরের হতে না হতে তার মা গেল ম'রে। কিছু দিন পরেই তার বাবা আর একবার বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এল।

সৎমা কোনও দিন ভাল হয় না, ভজুর সৎমাও হল না। সে এসেই কোথায় কি জিনিষ বেশী খরচ হচ্ছে, কোথায় কি নষ্ট হচ্ছে, সব গোছাতে

ব'সে গেল। সৎমা ভজুকে খুব মেপে-জুখে খেতে দিতে লাগল। ভজু সাধারণ ছেলে-মেয়ের চেয়ে পনেরো-কুড়িগুণ বেশী সচরাচর খেত, কাজেই এই অবস্থায় তার দুর্গতির সীমা রইল না। ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে সমস্ত দিনরাত চীৎকার কর্‌ত। পাড়াপড়শী সকলে "রাক্ষস ছেলে" ব'লে গাল দিতে লাগল এবং বাপ উত্ত্যক্ত হয়ে ক্রমাগত দিতে লাগল কানমলার উপর কানমলা।

কানমলায় ত আর পেট ভরে না? কাজেই বাধ্য হয়ে ভজুকে চুরি ধর্‌তে হ'ল। ঘরে ধরা পড়লেই, তার সৎমা ঝাঁটা-পেটা কর্‌ত, বাইরে ধরা পড়লে সেখানেও মার। সৎমার ক্রমে দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে হওয়াতে ভজুর উপর অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। বনের ফল, শাকপাতা যা পায় তাই খেয়ে পেটের আগুন নিভায়। তাকে কেউ লেখাপড়াও শেখাল না, কাজকর্ম্মও শেখাল না। তার একমাত্র বিদ্যে হ'ল খাওয়া, কিন্তু সে খাওয়া যে কোথা থেকে জোটে তার ঠিকানা নেই। গ্রামে যখন কোনও

বাড়ীতে বিয়ে কি শ্রাদ্ধ থাকত, তখনই যা এক ভজুর কপাল খুল্‌ত। পেট ভ'রে খেতে ত সে পেতই, তার উপর অনেকে তার খাওয়ার বহর দেখে খুসি হয়ে দু'চার আনা ক'রে বখ্‌শিষ্‌ দিত। তবে এমন সুদিন বেশী ঘন ঘন আসৃত না।

কিন্তু তার পোড়া অদৃষ্টে এ সুখও বেশী দিন সইল না। তার বাপও মারা গেল। সৎমা তখন চেলাকাঠ নিয়ে ভজুকে তাড়া ক'রে বাড়ীর বার করে দিল। গ্রামে কেউ তাকে জায়গা দিল না, অমন হাতীর খোরাক জোটাবে কে? কাজেই বেচারা ভজুকে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল।

সে চলতেই লাগল। কোথাও ভিক্ষে ক'রে খায়, কোথাও কুড়িয়ে খায়। যেখানে কিছু না জোটে, সেখানে শাকপাতা তুলে খায়। এই রকম ক'রে মাসের পর মাস চল্‌তে চল্‌তে সে মস্ত বড় এক সহরে এসে উপস্থিত হ'ল। নূতন যায়গা, কাজেই প্রথম প্রথম তার খাওয়ার কষ্ট হ'ল না। তামাসা দেখবার জন্যে অনেকেই তাকে ডেকে খেতে দিল।

একদিন ঠিক বাজারের মাঝখানে সে খেতে ব'সে গিয়েছে, এমন সময় ভীড়ের ভেতর থেকে একজন লোক ছুটে এসে তার হাত ধ'রে দাঁড় করিয়ে দিল। ভজু ত হাঁউ-মাঁউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। তার পাতে তখনও রাশীকৃত ডাল-ভাত মাখা, সে-সব শেষ না ক'রে নড়া যায়? সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমি না খেয়ে যাব না, তোমরা আমাকে ধোরো না।"

যে লোকটি তাকে ধ'রে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁর বেশ জমকালো পোষাক। তিনি বল্‌লেন, "তুমি কেঁদো না হে ছোক্‌রা, আমার সঙ্গে এস, তোমার খাওয়ার বেশ ভাল ব্যবস্থা করব। তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ?"

— ভজু বল্‌লে, "আমি অনেক দূরের গাঁ থেকে আস্‌ছি। আমার মা-বাবা নেই। সৎমা ভয়ানক মারে, তাই আমি পালিয়ে এসেছি।"

সে লোকটি সেই দেশের একজন রাজকর্ম্মচারী। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বল্‌লেন, "বেশ, বেশ, ঠিক তোমার মত একজন ছেলেই আমরা খুঁজ্‌ছিলাম।

তুমি আমার সঙ্গে রাজবাড়ীতে চল। বেশ ভাল কাজ পাবে।”

ভজু ডাল-ভাতের রাশের দিকে চেয়ে বল্‌লে, “আগে খেয়ে নি, তারপর যাব।”

রাজকর্ম্মচারী বল্‌লেন, “এ ছাই ডাল-ভাতের জন্যে দেরি ক’রে কি হবে? তুমি চল আমার সঙ্গে, পেট ভ’রে লুচি মিঠাই খেতে পাবে।”

লুচি মিঠাইয়ের নাম শুনে ভজু আর দেরি না ক’রে তাড়াতাড়ি গট্ গট্ ক’রে হেঁটে এগিয়ে চল্‌ল।

এদেশের রাজার দুই রাণী। বড়-রাণীর দুই ছেলে, ছোট-রাণীর শুধু একটি মেয়ে। তিনি বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেদের দুই চক্ষে দেখতে পারেন না। কি ক’রে তাঁদের পথ থেকে সরাবেন, এই খালি তাঁর চেষ্টা। রাজাও ছোট-রাণীর কথামত চলেন, কাজেই বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেদের উপর নানারকম অত্যাচার চলে। ছোট-রাণীর প্রতাপ বেড়েই চলেছে। এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বড়-রাণীর মহলে ঝি-চাকর শুদ্ধ কাজ

কর্‌তে ভরসা পায় না। দু-চারজন অনেককালের বুড়ো ঝি-চাকর ছাড়া আর সবাই পালিয়েছে। ভয়ে তাঁদের কাছে কোনও ছেলে-মেয়েও যায় না। একলা থেকে থেকে তাঁরা বড় মুষ্‌ড়ে পড়েছেন। দু-চারজন রাজকর্ম্মচারী ভেতরে ভেতরে বড়-রাণীকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাণী তাঁদের প্রায়ই অনুরোধ করতেন, ছেলেদের জন্যে একটি ছোকরা চাকর এনে দিতে। সে শুধু ছেলেদের সঙ্গে গল্প কর্‌বে আর খেলবে। ছেলেদের যত হাসাতে পারে, ততই ভাল। কিন্তু এরকম চাকর কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সহরের কোনও লোক রাজ-বাড়ীতে কাজ কর্‌বার জন্যে ছেলে দিতে চাইত না। আজ তাই পথের মাঝখানে ভজুকে পেয়ে রাজকর্ম্ম-চারীটি ভারি খুসি হয়ে গেলেন। এ ছেলে মানুষকে না হাসিয়ে যায় না। এর পেটটা দেখলেই ত অতি বড় গম্ভীর মানুষেরও হাসি আসে।

রাজকর্ম্মচারী ভজুকে বড়-রাণীর মহলে রাজ-কুমারদের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, "দেখ ভজু,

তুমি এই রাজকুমারদের সঙ্গে খেলবে, আর তাঁদের খুব হাসাবে। এইটা যদি করতে পার, তাহলে যত খেতে চাও, পাবে।”

এইবার ভজুর দিনগুলি বেশ কাট্‌তে লাগল। তাকে খেতে বসিয়ে মজা দেখা হল রাজকুমারদের এক কাজ। বলা বাহুল্য, এতে ভজুর কোনও আপত্তি ছিল না। খেয়ে খেয়ে পেটটি এমন ঢাকাই-জালার মত হয়ে উঠ্‌ল যে লোকে তাকে দেখলেই হেসে মরে।

কিন্তু ভজুর কপাল যে ভাল নয়, তা তোমরা আগেই বুঝ্‌তে পেরেছ। রাজার হঠাৎ অসুখ কর্‌ল। ছোট-রাণী ভাবলেন, রাজা যদি মারাই যান, তাহলে ত বড়-রাণীর ছেলে হবে রাজা, তিনি আর তাঁর মেয়ে পথে দাঁড়াবেন। সুতরাং এখন সাবধান হওয়া ভাল। রাজা ত বিছানায় প'ড়ে; ছোট-রাণী একখানা কাগজে তাঁর সই নিয়ে, বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেদের বন্দী কর্‌বার আদেশপত্র বের ক'রে ফেললেন। বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেরা বন্দী হলেন। সহরের বাইরে পুরনো এক

ছিল, জঙ্গল দিয়ে ঘেরা; সেইখানে তাঁদের নিয়ে রাখা হল। ঝি-চাকরেরা খালি বাড়ীতে ব'সে কান্নাকাটি করতে লাগল। সব চেয়ে জোরে চেঁচাতে লাগল ভজু, কারণ তার এত সাধের খাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

দু-তিনদিন কান্নাকাটি ক'রে যখন কোনও লাভ হল না, তখন ঝি-চাকরেরা যে যার পথ দেখ্‌ল। ভজু আর কোথায় যাবে? সে লোককে জিগ্‌গেষ কর্‌তে কর্‌তে সেই পুরনো দুর্গটার কাছে গিয়ে হাজির হল। কোনও গতিকে যদি ভেতরে ঢুক্‌তে পারে, তা হলে খাওয়ার ভাবনাটা যায়।

দুর্গের চারদিকে ত কড়া পাহারা, কেউ ভেতরে যেতে পায় না। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরে বড়-রাণী আর তাঁর ছেলেরা আছেন, সেই ঘর ছেড়ে তাঁরা বাইরে যেতে পারেন না। সহরের সব লোক 'হায় হায়' করছে, বড়-রাণী আর রাজ-কুমারেরা কি বেঁচে আছেন? রাক্ষসী ছোট-রাণী হয়ত তলে তলে তাঁদের মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছেন। যে-সব সৈন্যেরা দুর্গ পাহারা দিচ্ছিল,

ভজু তাদের কাছে গিয়ে অনেক সাধ্য-সাধনা কর্‌তে লাগল। সে ছেলেমানুষ, তাতে অতি বোকা, তাকে ভেতরে যেতে দিলে কোনও আশঙ্কা নেই। কাজেই দু-চারজন যেতে দিতে এক রকম রাজীই হল। কিন্তু পাছে ছোট-রাণী জান্‌তে পেরে গোলমাল বাধান, এই ভয়ে তাদের দলপতি শেষ পর্য্যন্ত ভজুকে ছাড়লেন না।

ভজু দু'দিন সেইখানেই ব'সে রইল। তৃতীয় দিন দেখা গেল, সৈন্যদের মধ্যে একটা কি ভয় ঢুকেছে। সবাইকার মুখ শুক্‌নো, সব যেন পালাতে ব্যস্ত। ভজু এগিয়ে গিয়ে জিগ্‌গেষ করলে, ব্যাপারখানা কি? সৈন্যদের দলপতি বল্‌লেন, "বড়-রাণীমার বসন্ত হয়েছে। ও রোগ যেমন তেমন নয়, একজনের হলে আশের পাশের সকলের হবে।"

ভজু বল্‌লে, "তোমরা ত কেউ ওপরে যাও না, কি ক'রে জান্‌লে যে তাঁর বসন্ত হয়েছে?"

দলপতি বললেন, "যে বুড়ীটা তাঁদের খাবার নিয়ে যায়, সে এসে বলেছে। এখন সে ত আর

কিছুতেই ভেতরে যেতে রাজী নয়। ওঁদের খাবার পাঠাবার কি ব্যবস্থা করা যায় তাই ভাব্‌ছি। এখন কোনও লোকই আর ও ঘরে যেতে চাইবে না।”

ভজু বল্‌লে, “আমায় যেতে দাও ত আমি রাজী আছি। আমার খেতে পেলেই হল, আমি বসন্ত টসন্তকে গ্রাহ্য করি না।”

আর কোনও লোক যখন পাওয়াই যাবে না, তখন দলপতিকে অগত্যা রাজী হতে হল। ভজু খাবারের বোঝা মাথায় ক’রে নিয়ে, অনেক কষ্টে ভাঙা দেওয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌ল। সেই পাথরের ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিতে লাগল। খানিক পরে দরজা খুলে বড় রাজকুমার উঁকি মেরে দেখ্‌লেন।

ভজু মহা খুসি হয়ে ব’লে উঠ্‌ল, “রাজকুমার, রাজকুমার, আজকে আমি খাবার নিয়ে এসেছি।”

রাজকুমারও খুসিই হয়েছেন মনে হল, তবু তাঁর মুখের ভাবটা কেমন কেমন যেন লাগল। ভজুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে তিনি বললেন,

"শীগ্‌গির ভেতরে চ'লে এস, আমি বেশীক্ষণ দরজা খুলে রাখ্‌তে পারব না।"

ভজু সব কিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দেখ্‌লে, একখানা খাটের উপর কে একজন মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, আর-একখানা খাটের উপর ছোট রাজকুমার মুখ শুকিয়ে ব'সে আছেন। ভজু খাবার দাবার গুছিয়ে রেখে জিগ্‌গেষ করলে, "ঐ বুঝি রাণীমা? তিনি কি কিছুই খেতে পারেন না?"

বড় রাজকুমার বল্‌লেন, "চুপ, চুপ, অত জোরে চেঁচাস্‌নে, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেল্‌বে; মা এখানে নেই।"

ভজু অবাক্ হয়ে চোখ বড় বড় ক'রে বল্‌লে, "তিনি কোথায় গেছেন? কি ক'রে গেলেন? চার দিকে ত লোক?"

বড় রাজকুমার বল্‌লেন, "তুই আমাদের নিজের লোক, তাই তোর কাছে বল্‌ছি, কিন্তু একথা যেন কিছুতেই বাইরে প্রকাশ না পায়। আমাদের মামার বাড়ীর লোকেরা আমাদের নিয়ে পালাবার জন্যে খুব চেষ্টা করছে। সামনাসামনি যুদ্ধ করলে

ত তারা হেরে যাবে, তাই লুকিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। ঐ যে কোণটায় একটা পাথর আল্‌গা দেখছিস্, ওটা সুড়ঙ্গের মুখ। কাল রাত্রে মা ওর ভেতর দিয়ে পালিয়েছেন। তিনি আগে যেতে চাননি, আমরা তাঁকে জোর ক'রে পাঠিয়েছি। ধরা পড়বার ভয়ে আমরা মায়ের বসন্ত হয়েছে ব'লে রটিয়েছি, আর একটা কাপড়ের বস্তা মায়ের খাটে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। একটা বোবা-কালা ঝাড়ুদার সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘর ঝাঁট দিতে আসে, তাকে কিছু ভয় নেই। তবে যে লোকটা খাবার আন্‌ত, তাকে ভয় ছিল। তুই তার জায়গায় এসেছিস্, এখন কোনও ভয় নেই।"

ভজু বল্‌লে, "তোমরা সবাই কাল পালালে না কেন ?

রাজকুমার বললেন, "শুধু এ ঘরটার থেকে বেরলেই ত হবে না, এ রাজ্য থেকে বেরতে হবে। তা করতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে। সবাই একসঙ্গে পালালে, পরদিন যখন খাবার আনবে,

তখনই সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাই পাঁচ ছ' দিন ধ'রে ক্রমাগত ওদের ধাপ্পা দিতে হবে। কি ক'রে সেটা হবে, তাই ভাবছি।"

ভজু বল্‌লে, "আজ রাত্রে তোমরা দু'জন পালাও ত, তারপর দেখা যাবে। খাবার ত আমিই আনব, আর ঝাড়ুদার ত বোবা কালা, কাজেই চার পাঁচ দিন কেউ জানতে পারবে না। তারপর সময় বুঝে আমিও স'রে পড়্‌ব।"

রাজকুমার বল্‌লেন, "কিন্তু আর একটা মুস্কিল আছে। তিনজনের যে গাদি গাদি খাবার আস্‌তে থাকবে, সেগুলো কি হবে? ঝাড়ুদারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—ঘরের মধ্যে যা কিছু পাবে, সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে বোধহয় ওরা সে-গুলো নেড়ে চেড়ে দে'খে নেয়, তার ভেতর দিয়ে আমরা কোনও খবর টবর পাঠাচ্ছি কিনা। যদি রাশ রাশ খাবার যেমন ঢুকছে তেমনই বেরুচ্ছে দেখে, তখনই সন্দেহ করবে।"

ভজু একটুক্ষণ ভাবল, তারপর বল্‌লে, "তা হোক, তোমরা যাও। আমার আর কোনও

শক্তি নেই, শুধু খেতে পারি। তা তোমাদের জন্যে না-হয় খেতে খেতে ম'রেই যাব। ঝাড়ু-দার শাল-পাতার ঠোঙা ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাবার খুঁজে পাবে না।"

রাত্রি হতেই রাজকুমারেরা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালালেন। পরদিন ভজু ঠিক সময়ে খাবার নিয়ে গিয়ে হাজির হল। ঘর খালি। তিন জনের বিছানার উপর সে কাপড় চোপড় বালিশ সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল, যেন তিন জন ঘুমচ্ছেন। তারপর ব'সে গেল খেতে। এমন চমৎকার সব খাবার, যত খায়, ততই তার ক্ষিদে যেন বেড়ে যায়। প্রায় সবই সে শেষ ক'রে ফেল্ল। তারপর আর তার উঠবার ক্ষমতা রইল না। মেঝেতে প'ড়ে সে ঘুম দিতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় বোবা ঝাড়ুদার এসে তাকে গুঁতো মেরে উঠিয়ে দিল। বিছানায় কে আছে না আছে, তা আর চেয়েও দেখল না। রাত্রে এমন জায়গায় থাকতে ভজুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সেও ঝাড়ুদারের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়্ল।

ঝাড়ুদার তার ঝাঁটা বালতি নিয়ে সোজা দলের দলপতির কাছে হাজির হল। সে ব্যক্তি উল্‌টে পাল্‌টে সব আবর্জ্জনা-গুলো দে'খে বল্‌লে, "খাবার কিছু কিছু থেকে গিয়েছে দেখ্‌ছি।"

ভজু তাড়াতাড়ি বললে, "সকলেরই শরীর খারাপ কিনা, বেশী খেতে পারেন না।"

দলপতি বললেন, "আচ্ছা এক কাজ জুটেছে বাবা! কখন যে আমাদেরও বসন্তে ধরে তার ঠিক নেই। খুব বেশী অসুখ নাকি ছেলেদেরও? বদ্যি-টদ্যির ব্যবস্থা করতে হবে?"

ভজু ভয় পেয়ে বললে, "না না, তেমন কিছু নয়। মায়ের অসুখের জন্যে মন খারাপ, তাই তারা খেতে পারে না।" মনে মনে সে ঠিক করল, কাল ম'রে গেলেও সে সব খাবার শেষ কর্‌বে।

পরদিন খাবার নিয়ে গিয়েই সে খেতে ব'সে গেল। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু সে সব শেষ কর্‌বে। সন্ধ্যা হবার আগে, খাবারের স্তূপ শেষ হল বটে, কিন্তু ভজু বেচারার আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না। কিন্তু রাত্রে ত এখানে থাকা

যায় না ? কোনও রকমে সে বেরিয়ে এল। তার পেটের বহর দেখে দলপতি আর সৈন্যরা ত অবাক্। দলপতি জিগ্‌গেষ করলেন, "ওহে একি হয়েছে ?"

ভজু কোঁকাতে কোঁকাতে বললে, "কি জানি, কি অসুখ। পিলেটা ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে।"

তারপর দিনটাও এই ভাবে কাটল। সেদিন ভজু বেচারা আর নিজে বেরতে পারল না, ঝাড়ুদার কোনও মতে টান্‌তে টান্‌তে তাকে বাইরে নিয়ে এল। দলপতি বললেন, "এ ছোঁড়াও মর্‌বে। এমন পিলে জন্মে কারো দেখিনি।"

সকালে উঠে ভজু ভাবছিল, আজ আর যাবে কিনা। পেটের যা অবস্থা হয়েছে, হঠাৎ ফেটেও যেতে পারে। তবু মনিবের জন্যে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।

সে আস্তে আস্তে যাচ্ছে, এমন সময় একটা লোক এসে তাকে ধর্‌ল। কানের কাছে মুখ নিয়ে জিগ্‌গেষ করল, "তোমার নাম ভজু ?"

ভজু বললে, "হ্যাঁ।"

সেই লোকটি বল্‌লে, "আমি বড়-রাণীমার রাজ্য

থেকে আস্‌ছি। তাঁরা পৌঁছে গেছেন, তোমায় নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন। তোমাকে না হলে রাজকুমারদের কিছুতেই চলবে না।”

ভজু মনের আনন্দে বেরিয়ে পড়ল। নূতন দেশে গিয়ে, তার আদর দেখে কে? সবাই তাকে এত আদর ক’রে খাওয়াতে লাগল যে, ভজুরও খাওয়ায় অরুচি ধরবার জোগাড়। সে বেশী খায় বললে, রাণী আর রাজকুমারেরা সবাই চটে যান, আর বলেন, “বেঁচে থাক আমাদের ভজুর খাওয়া। ঐ গুণে আমরা রক্ষা পেয়েছি।”

নীলাম্বরী

ঢং ঢং ঢং, স্কুলের শেষ ঘণ্টা প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে মেয়ের দল, স্কুল বাড়ীর সব ক'খানা ঘর খালি ক'রে চাতালে বেরিয়ে এল। গাড়ীবারাণ্ডার নীচে ভীড় সবচেয়ে বেশী। সার সার স্কুলের বাস্ গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষয়িত্রী একজন দাঁড়িয়ে আছেন, মেয়েরা ঠিক গাড়ীতে ওঠে কিনা তার তত্ত্বাবধান ক'র্‌তে।

এটা হল কিছুদিন আগেকার কথা। তখনও সব স্কুলে এখনকার মত মোটর বাস্ হয় নি। বড় বড় ঘোড়াতেই স্কুলের গাড়ী টান্‌ত। কাজেই ছু-তিন খেপ্ না গেলে চল্‌ত না। যারা দ্বিতীয় বারে কি তৃতীয় বারে যেত, তাদের বাড়ী পোঁছতে অনেক দেরী হয়ে যেত। কাজেই অধিকাংশ মেয়েরই চেষ্টা ছিল, কি ক'রে শিক্ষয়িত্রীর চোখ এড়িয়ে প্রথম বারেই গাড়ীতে উঠে পড়া যায়।

ধরা প'ড়লে বেশ বকুনি আছে অদৃষ্টে। কিন্তু সেই ন'টায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ব'সে থাকতে কোনও মেয়েরই মন উঠ্‌ত না। নিতান্ত যাদের বোর্ডিংএর কোনও মেয়ের সঙ্গে বেশী ভাব আছে, তারা দু-চারজন গল্প করবার লোভে থাকতে রাজী হত, আর কেউ না। বাকীরা লুকিয়ে চুরিয়ে গাড়ীতে উঠে, একেবারে ভিতর দিকের কোণে লুকিয়ে বস্‌ত, যাতে শৈলজাদি তাদের দে'খে নামিয়ে না দেন। অবশ্য এরকম নামিয়ে দেওয়াটাও প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঘট্‌ত।

সুধার শরীরটা আজ ভাল ছিল না। ঝি আসেনি বাড়ীতে, কাজেই মা তাড়াহুড়ো ক'রে বেশী কিছু রান্না ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। নিতান্ত আগুনের মত গরম ভাতে ডালের জল মেখে লেবু দিয়ে দু-চার গ্রাস খেয়ে সে চ'লে এসেছে। মা তাকে আস্‌তে বারণই করেছিলেন, কিন্তু সে রাগ ক'রে শোনেনি। নিত্য ঝি আসেনি; নিজের অসুখ, মায়ের অসুখ, এই-সব অছিলায় কত আর

কামাই করা যায়? হেড্‌মিষ্ট্রেসের কাছে বকুনি খেতে ত তাকেই হয়? টিফিনের সময় সে কিছু খায় না। তাদের ঐ এক ঠিকে ঝি সম্বল, সে এতদূরে খাবার নিয়ে আস্‌তে নারাজ। অনেক মেয়ে বোর্ডিংএ খরচ দিয়ে টিফিন খায়, সুধার বাবার অবস্থা ভাল নয়, তিনি তাও কর্‌তে পারেন না। কাজেই স্কুল যখন ছুটি হয়, তখন সুধার পেটটা একেবারে জ্ব'লে যেতে থাকে। সে আসে 'সেকেণ্ড বাসে', কাজেই প্রথমবারে যাবার অধিকার তার নেই, তবে প্রায়ই সে লুকিয়ে যায়, কোনওদিন ধরা পড়ে, কোনওদিন বা পড়ে না।

আজ তার যাবার তাড়া ছিল সবচেয়ে বেশী। শরীর ভাল নয়, ক্ষিদেও পেয়েছে ভয়ানক। ঝি নিশ্চয়ই এ বেলাও আসেনি, মা একলা-হাতে সব কাজ কখনও পেরে উঠ্‌বেন না। খোকাই তাঁকে জ্বালিয়ে খাবে। কিন্তু আজ যে যেতে পারবে, তা তার মোটেই আশা হচ্ছিল না। কে দু'জন মেয়ে বেড়াতে এসেছিল, স্কুলের পুরোনো ছাত্রী বোধ হয়। শৈলজাদির ঘরে ব'সে তারা সারাদিন গল্প

করেছে, চা খেয়েছে, এখন নেমে এসেছে—বাড়ী ফিরবার জন্যে। ও মা, তিনি দেখি তাদের স্থধাদের বাসেই তুলে দিচ্ছেন। তা হ'লেই হয়েছে স্থধার আজ আগে আগে বাড়ী যাওয়া। যাদের সত্যিই প্রথমবার যাবার পালা, তাদেরই দু'চারজনকে না নামিয়ে দেওয়া হয় ত ঢের।

নিজের গোছান বইখাতা-গুলো নিয়ে স্থধা চাতালের একটা কোণে, বড় একটা থামে ঠেশ দিয়ে ব'সে পড়ল। হলের ভিতর ঢুকতে আর তার ইচ্ছে করছিল না। মস্ত বড় চাতাল, জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা প'ড়ে সবুজ, জায়গায় জায়গায় কালের প্রভাবে কালো এবং ভাঙ্গা, মস্ত মস্ত গোল থাম দিয়ে ঘেরা। এই চাতালটাতে টিফিনের ছুটিতে মেয়েদের খেলা, গল্প, দৌড়-ধাপ সব চলতে থাকে। এক কোণে খুপ্‌রীর মত একটা ঘর, তার ভিতর দিয়ে ছাদে যাবার সিঁড়ি। এইখানে 'ডে স্কলার' মেয়েদের জল খাওয়ার স্থান। বন্ধু-বান্ধবরা ডাকলে স্থধাও মাঝে মাঝে এখানে ঢুকে খাবার খেয়েছে। আজ যদি তাকে কেউ ডাকত, মন্দ হত না।
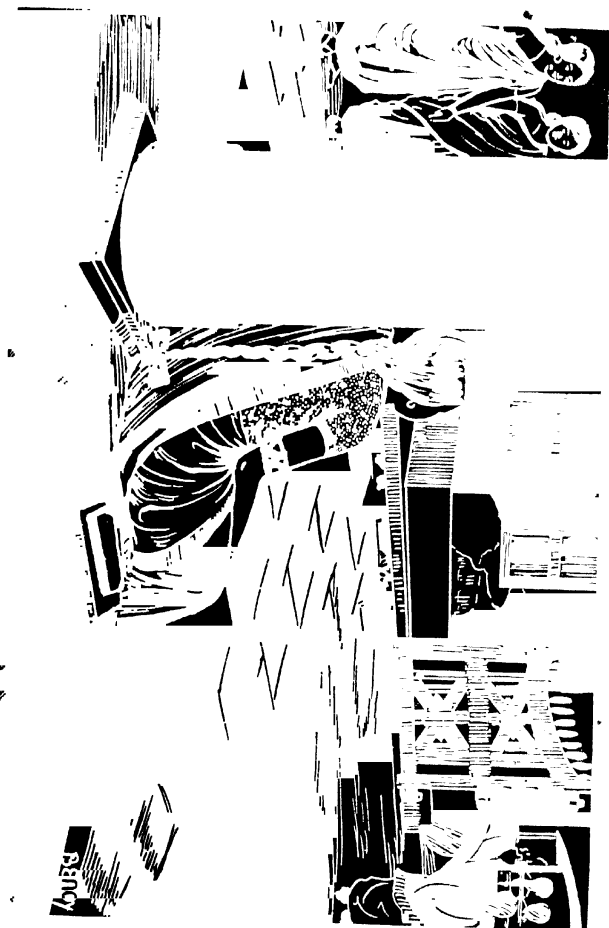
সুধা চাতালের একটা কোণে, বড় একটা থামে ঠেশ দিয়ে বসে পড়ল

তার চারপাশে মেয়ের দল ঘোরাফেরা ক'রে গল্প করছিল। স্কুলের ছুটির পর দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলার মত উৎসাহ কোনও মেয়েরই আর থাকে না, অর্দ্ধেক তার মত ব'সে পড়ে, বাকি অর্দ্ধেক গল্প ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

তার সামনে দিয়ে কলেজের নিভাদির সঙ্গে পারুল বারবার ঘুরে যাচ্ছিল। নিভাদির সঙ্গে পারুলের বেজায় ভাব। এই নিয়ে স্কুল শুদ্ধ মেয়ে তাকে ঠাট্টা করে, কিন্তু পারুলের এতে গর্ব্বের সীমা নেই। নিভাদির মত 'স্মার্ট' বিদুষী মেয়ে কলেজে ক'টাই বা আছে? দেখতে অবশ্য তিনি সুন্দরী কিছু নন্, কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়ালে সুন্দরী মেয়েদেরও যেন কেমন হাবাগোবা দেখায়। তাঁর লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারাটি ঠিক যেন আলোক-শিখার মত, কোথাও তার ভার বা জড়তা নেই। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বড় জোর বলা যায়, কিন্তু যে রংএরই কাপড় পরুন, তাঁকে দিব্যি মানায়। ঐ ত পারুল তাঁর পাশে পাশে বেড়াচ্ছে, সেও ত ফর্শা ব'লেই বিখ্যাত, কিন্তু নিভাদির পরণে ঐ

যে জরির পাড় দেওয়া নীলাম্বরী শাড়ীখানা, ওখানা পারুল পর্‌লে কি তাকে অত ভাল দেখাত ? কখনও না।

আচ্ছা, নিভাদি ত বিশেষ বড় লোকের মেয়ে না, এত সাজেন কি ক'রে ? যে-রকম কাপড়-চোপড় তিনি রোজ প'রে কলেজে আসেন, সে-রকম কাপড় সুধার একখানাও নেই। উৎসব নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতেও তাকে ধোওয়া মিলের শাড়ী প'রে যেতে হয়—এই দুঃখ আর লজ্জায় সে কোথাও যেতেই চায় না। না যাওয়ার কারণটা মা-বাবাকে জানানও শক্ত, তাঁরা অমনি বকতে ব'সে যাবেন—যেন ভাল জিনিষ ভাল লাগাটা মস্ত একটা অপরাধ। শাদাসিধে জীবনযাত্রা এবং মহৎ চিন্তা যে কত বড় জিনিষ, সেই বিষয়ে বাবার কাছে লম্বা একটা বক্তৃতা শুন্‌তে হয়। বেশ ত, মহৎ চিন্তা কি একখানা ভাল কাপড় প'রে করা যায় না ? একথা মা-বাবা কিছুতেই বুঝবেন না। মা-বাবার দুঃখ-দারিদ্র্য বেশ ভাল ক'রে বুঝ্‌বার মত বয়স সুধার তখনও হয়নি।

নীলাম্বরী

নিভাদির শাড়ীটা আজ সুধার চোখে বড়ই সুন্দর লাগ্‌ছিল। সুধার গায়ের রং প্রায় ফর্‌শাই—এরকম একখানা শাড়ী হলে তাকে নিশ্চয় মানাত। কিন্তু কে বা তাকে দিতে যাচ্ছে। সামনের মাসে তার জন্মদিন বটে, কিন্তু কি যে সে পাবে তার তা জানাই আছে। যদি মায়ের হাতে পয়সা থাকে, তাহ'লে কাপড়ওয়ালী বিধুমুখীকে ডেকে আড়াই টাকা তিন টাকার একখানা তাঁতের শাড়ী কিনে দেবেন, না হলে সেই ধোওয়া মিলের শাড়ী। ভাব্‌তেই সুধার চোখে জল এসে গেল। এত বয়স হল, অথচ একদিনের জন্যে একটা জরিপেড়ে কাপড়ও সে পরতে পেল না, সিল্কের কাপড় ত মাথায় থাক্। অথচ আশেপাশের বাড়ীর ছেলে-মেয়েগুলো জন্মাতে না জন্মাতেই সিল্ক-সাটিনে মোড়া হয়ে থাকে। ঐ ত সেদিন তড়িৎদির খুকীটা হল; বাবা, মেয়ে হবার আগের থেকেই তার জন্যে দু'বাক্স কাপড়-জামা তৈরি হয়ে রইল।

ঘড়্ ঘড়্ ক'রে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল।

সুধা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখ্‌ল। ঐ ত সবে ফৈজুর গাড়ী এল, এর পর আসবে সৈয়দের গাড়ী, তারপর সুধাদের গাড়ী। এই গাড়ীতে নিভাদি যান, পারুল তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হলের ভিতর থেকে তাঁর গোছান বইখাতা সব নিয়ে এল। নিভাদি গাড়ীতে উঠে পড়লেন, অন্য মেয়েরাও ছুটোছুটি ক'রে এসে উঠ্‌ল, গাড়ী ছেড়ে দিল।

পারুল গাড়ীর কাছ্‌ থেকে ফিরে এসে, কি মনে ক'রে সুধার পাশে ব'সে পড়ল। বল্‌লে, "অমন হাঁড়ি-মুখ ক'রে ব'সে আছিস্‌ কেন রে?"

পারুলকে সুধার বিশেষ কিছু ভাল লাগত না। তবু কথা যখন যেচে বল্‌ছে, তখন ত আর উত্তর না দিয়ে থাকা যায় না? বল্‌লে, "আমার আজ শরীরটা বড় খারাপ লাগ্‌ছে।"

পারুল জিজ্ঞেস করল, "তাহলে ফার্ষ্ট বাসে চ'লে গেলি না কেন?"

সুধা বল্‌লে, "কোথায় আর জায়গা পেলাম? বাইরের দু'জন মেয়ে উপরি গেল।"

পারুল বল্‌লে, "তা বেড়া না? ব'সে থাকিস্‌ কি

ক'রে? আমি ত হাজার ক্লান্ত হলেও বস্‌তে পারি না।"

সুধা বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "তা নিভাদির পাশে বেড়াতে পেলে তোমার আর ক্লান্ত লাগ্‌বে কোথা থেকে? আমার ত আর ওরকম বন্ধু কেউ নেই?"

পারুল খোঁচা খেয়ে পরম আপ্যায়িত হয়ে বল্‌লে, "সত্যি ভাই, নিভাদির সঙ্গে বেড়াতে পেলে আমার মোটেই ক্লান্ত লাগে না। আচ্ছা, আজ তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, না? শাড়ীখানা কেমন লাগ্‌ল তোর?"

সুধা উপেক্ষার ভান ক'রে বল্‌লে, "কেমন আবার লাগ্‌বে, কাপড় যেমন হয়।"

পারুলের বোধহয় আশা ছিল যে সুধা শাড়ী-খানার খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর্‌বে। সুধার কথায় একটু দ'মে গিয়ে বল্‌লে, "আমার কিন্তু ভাই ওটা ভারি ভাল লেগেছিল। কাপড়ওয়ালীর দু-পুঁটলি কাপড় তোলপাড় ক'রে তবে ওখানা আমি বার করেছিলাম।"

সুধা বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "শাড়ীখানা তুমিই দিয়েছ নাকি নিভাদিকে ?"

পারুল ঘাড় নেড়ে হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ, জানুয়ারী মাসে ওঁর জন্ম-দিন না ? তখন দিয়েছি। একবারও পর্‌তে দেখিনে, আমি অনেক ক'রে বলাতে আজ প'রে এসেছিলেন।"

সুধা একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে বস্‌ল, "শাড়ীখানার দাম কত রে ?"

পারুল সগর্ব্বে বল্‌লে, "বারো টাকা। বাবা, ছ-মাস পকেট-মাণি জমিয়ে তবে কিনেছি।"

সুধা আবার জিজ্ঞেস করলে, "ওখানা এগার হাত ত ? দশ হাত একখানার দাম কত হয় তাহলে ?"

পারুল বল্‌লে, "টাকা দশ হবে বোধহয়। কেন তুই কিন্‌বি নাকি ?"

সুধা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমি কিন্‌ব না আর কিছু। এমনি কথার কথা একটা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলাম।"

এমন সময় ঢং ঢং ক'রে বোর্ডিংএর ঘণ্টা বেজে

উঠল। পারুল জিভটা সভয়ে খানিকটা বার ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। সুধার গাড়ীখানাও আজ কি ভাগ্যে কয়েক মিনিট আগে এসে পৌঁছল। সুধা নিজের বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল।

সারা পথ গাড়ীতে যেতে যেতে একই কথা সে ভাবতে লাগল। দশ টাকার শাড়ী মা সাত জন্মেও তাকে কিনে দেবেন না। তাঁর নিজেরও বোধহয় দশ টাকা দামের কোনও কাপড় নেই। বিয়ের সময়ের সেই লালপেড়ে গরদখানা ছিল, তা সেখানাও ক্রমাগত প'রে প'রে ছিঁড়ে এসেছে। এক সুধা যদি নিজে টাকা জমিয়ে কিন্‌তে পারে। কিন্তু কোথা থেকে সে পয়সা জমাবে? সে ত আর বোর্ডিংএর মেয়েদের মত পকেট-মাণি পায় না! ছেলে-মানুষ সে, বিদ্যাবুদ্ধি এত কিছু নেই যে মাষ্টারি ক'রে বা ট্যুশনি ক'রে টাকা আন্‌বে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তেই বাড়ী এসে পৌঁছল। ঝি এবেলাও আসেনি, কাজেই ফিরে এসেই খেতে পাওয়ার বদলে সুধাকে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে নোংরা

কলতলায় ব'সে যেতে হল। দুঃখে এবং শারীরিক ক্লান্তিতে সুধার চোখে জল এসে পড়েছিল, শাড়ীর চিন্তা তার মন থেকে উড়েই গেল।

বাসন মাজা শেষ হতে না হতেই মা খাবার তৈরী ক'রে সুধাকে ডাক দিলেন। গরম গরম পরেটা আর ও-বেলার মাছের তরকারি খেতে পেয়ে সুধার মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল। খাওয়ার বাসনগুলো চট্ ক'রে তুলে ধুয়ে দিয়ে, সে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দু'খানি মোটে তাদের ঘর। একখানিতে সুধারা দুই মায়ে ঝিয়ে শোয়, ছোট খোকাও অবশ্য মায়ের সঙ্গেই থাকে। আর একখানা ঘরে সুধার বাবা আর তার দাদা বিকাশ শোয়। ঐ ঘরেই লোকজন এলে বসে, বিকাশ পড়াশুনোও করে। সুধাদের ঘরে দুখানা তক্তপোষ, আর ছোট একটা টেবিল, তার উপর সুধার বই, খাতা, দোয়াত, কলম, পেন্সিল সব সাজান থাকে। এক কোণে দেওয়ালের গায়ে ঝোলান আল্‌নাতে তাদের কাপড়-চোপড় থাকে। একটা টুল টেবিলের সামনে

সুধার ব'সে পড়বার জন্যে। আর কোনও আসবাব নেই ঘরে। বড় দুটো বাক্স তক্তপোষের তলায় ঠেলা আছে, হঠাৎ ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে না।

অন্য ঘরটায় তক্তপোষ নেই। মাটিতে বিছানা ক'রে সুধার বাবা শোন, বিকাশও তাই শোয়। সকালেই সুধা সে-বিছানাগুলো গুটিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসে। ওখানেও ছোট একটা টেবিল আছে, তবে এ ঘরের খানার চেয়ে কিছু বড়। গোটা-তিন চেয়ার আর একটা বেঞ্চি আছে সেখানে, বাইরের কেউ এলে বসে।

নিজের টেবিলটার সামনে ব'সে ব'সে সুধা উপায় চিন্তা করতে লাগ্‌ল। সত্যি, এ রকম ক'রে আর পারা যায় না। তেরো পূরে চোদ্দয় পা দিতে চলেছে সে, অথচ এখন পর্য্যন্ত দু-আনা পয়সা কখনও নাড়া-চাড়া করেনি। মা-বাবা গরীব, কোথা থেকে তাকে দেবেন? কিন্তু গরীবের মেয়ে ব'লে কি সুধার সখ ব'লেও কোনও জিনিষ নেই, না, স্কুলের মেয়েদের কাছে মান রেখে চল্‌তে তার ইচ্ছা করে না?

পাশের বাড়ীর ঊষা এসে ডাকল, "এই সুধা, চল্‌না ভুতিদের ছাদে একটু বেড়িয়ে আসি।"

সুধা উঠে পড়ল। ভুতিদের বাড়ী কাছেই, গলিটা পার হলেই হয়। তাদের মস্ত বাড়ী, ছাদটাও মস্ত। সুধা, ঊষা প্রভৃতি পাড়ার মেয়েরা প্রায়ই বেড়াতে এখানে আসৃত, কারণ তাদের বেড়াবার আর কোনও জায়গা বড় ছিল না।

ভুতিদের বাড়ী যেমন বড়, তেমনই লোকজনও এক পাল। তার নিজের মা বাবা, ভাই বোনরা ত আছেই, তা ছাড়া নিকট এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভর্ত্তি। সুধারা দোতলায় উঠেই শুন্‌ল ভুতি ছাদে আছে, তারাও সোজাসুজি উপরে চ'লে গেল।

ভুতি আর তার বোন কুশি ছাদের এক কোণে ধুপ্‌ধাপ্ ক'রে খুব স্কিপ্ কর্‌ছিল। সুধাকে ডেকে বল্‌লে, "এই লতাপাতা, স্কিপ্ কর্‌বি ত আয়।"

সুধা বল্‌লে, "বাবা, এই ত স্কুল থেকে এলাম, এখন অত ধিন্‌-ধিন্ ক'রে লাফাবার ক্ষমতা নেই।"

কুশি বল্‌লে, "হ্যাঁ, পড়্‌তে আমার বাবার হাতে ত বুঝ্‌তে ঠেলা। স্কুলেই যাও, আর মাটিই কোপাও, সন্ধ্যাবেলা ধিন্‌-ধিন্‌ ক'রে নাচতেই হবে। শুন্‌ছিস্‌, আবার পরশু থেকে আমাদের ঘুঁসি-লড়া আর লাঠি-খেলা শেখাবার মাষ্টার আস্‌ছে। তোরা কেউ শিখবি ?"

ঊষা বল্‌লে, "আমরা ত আর পণ্টনের সেপাই হব না, ও-সব শিখে কি হবে ? বরং গান-বাজনা কি ছবি-আঁকা হলে শিখ্‌তাম।"

ভুতির দৌড়ধাপ, মারপিট্‌ বেশ ভাল লাগে। বাড়ীর সকলে তাকে 'মদ্দা ভগবতী' ব'লে ক্ষ্যাপায়, কেবল তার বাবা ছাড়া। তাঁর এ-সবে ভারি উৎসাহ। তিনিই জোর ক'রে মেয়েদের লাঠি-খেলা ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা কর্‌ছেন।

কুশির ও-সব কিছু ভাল লাগে না, তার ভাল লাগে ছবি-আঁকা, কাপড়ে ফুল তোলা—এই সব ; কিন্তু বাবা সে-সব কথায় কানই দেন না। ছেলে নেই ব'লে, মেয়েদেরই ছেলের মত ক'রে মানুষ কর্‌তে তিনি ব্যস্ত।

তাই উষার কথায় কুশি বল্‌লে, "হাঁ, শেখাচ্ছে গান-বাজনা! বলে একটা শেলাইয়ের টীচারের জন্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠে গেল, কিন্তু কিছুতেই যদি বাবা কথাটা কানে তুল্‌লেন। বেশী চেঁচালেই বলেন, 'নিজেরা নেনা জোগাড় করে'।"

হঠাৎ সুধার মাথায় একটা বুদ্ধি খে'লে গেল। আচ্ছা, সে ত বেশ ভাল শেলাই জানে। প্রত্যেক-বার ক্লাশের শেলাইয়ের প্রাইজ্‌টা ত সে পায়ই, তা ছাড়া একবার মেলাতে মেডেল শুদ্ধ পেয়েছে। সে কি কুশিকে শেলাই শেখাতে পারে না? বলে দেখ্‌বে নাকি? তারা যদি সুধাকে পাঁচ টাকা ক'রেও মাইনে দেয়, তা হলেও সুধার কত কাজে লাগে।

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে সে কুশিকে ছাদের একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "ভাই, আমি তোকে শেলাই বেশ শেখাতে পারি। আমি উলবোনা, এম্‌ব্রয়ডারি, কাটছাঁট্‌ সব শিখেছি। আমাকে টীচার রাখ্‌বি?"

কুশি খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে থেকে বল্‌লে, "তুই

হলে ত ভালই হয়, কিন্তু তুই কখন শেখাবি ? স্কুল থেকে ফির্‌তেই ত তোর সন্ধ্যে হয়ে যায়।”

সুধা বল্‌লে, “শনি-রবিবারে আস্‌ব, দু’ঘণ্টা ক’রে চার ঘণ্টা শেখাব হপ্তায়। তাহলেই ত হবে ?”

কুশি বল্‌লে, “আচ্ছা, চল্‌ মাকে জিজ্ঞেস ক’রে আসি।”

কুশির মা তখন ঠাকুরকে কি কি রান্না হবে তাই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কুশি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লে,“মা, সুধাকে আমি শেলাইয়ের টীচার রাখ্‌ব। ও খুব ভাল শেলাই জানে, সেবারে মেলায় মেডেল পেয়েছে।”

কুশির মা হেসে সুধার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, “হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, তুমি পার্‌বে ? তোমার সময় কখন হবে ?”

সুধা মুখ নীচু ক’রে বল্‌লে, “আমি শনিবারে আর রবিবারে দুপুর বেলা আস্‌ব।”

কুশির মা বল্‌লেন, “আচ্ছা, সে বেশ হবে।” কুশি সুধাকে টেনে নিয়ে আবার ছাদে চ’লে গেল।

আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে সুধা বাড়ী চ'লে গেল। মাইনের কথা যদিও কিছু হল না, তবু সুধা মনে মনে জান্‌ল, ওঁরা শুধু শুধু তাকে খাটাবেন না, মাইনে নিশ্চয়ই কিছু দেবেন।

প্রথম শনিবারে সে যখন কুশিদের বাড়ী গেল, তখন ভুতি ছুটে এসে তার হাত ধ'রে বল্‌লে, "আসুন আসুন টীচার মশায়, আপনার ছাত্রী ঐ ঘরে ব'সে আছে।"

সুধার একটু লজ্জা হল, সবাই হয়ত তাকে খুব বেশী অদ্ভুত ভাবছে। কিন্তু যখন এসেছেই, তখন পিছলে চল্‌বে না। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি শেলাইয়ের সরঞ্জাম টেনে নিয়ে ব'সে গেল। কুশিরও এ দিকে মন খুব, তাকে শেখাতে সুধার কিছুই কষ্ট হল না। সময়টা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, তারা টেরই পেল না। ফিরে আসবার সময় কুশির মা তাকে জলখাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না, বেশ ক'রে খেয়ে-দেয়েই সে বাড়ীতে ফির্‌ল।

আস্‌বার সময় সিঁড়িতে ভুতির মা ব'লে দিলেন,

"দেখ সুধা, তোমার মাকে ব'লো যে আমরা তোমায় মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে হাত-খরচের জন্যে দেব।"

সুধা অত্যন্ত খুসি হয়ে বাড়ী ফিরে এল। দশ টাকা ক'রে পেলে তার যে কত কাজ হয়, তার ঠিকানা নেই।

মাসটা কেটে গেল। প্রথম উপার্জ্জনের টাকা হাতে পেয়ে তার যে কি রকম আনন্দ হ'ল তা আর বলবার নয়। টাকাটা নিয়ে এসে সে মায়ের হাতেই দিল। তিনি সেটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "তুমি রাখ মা, তোমার পচ্ছন্দমত কোনও জিনিষ কিনো।"

সুধা টাকাটা নিজের কাপড়ের বাক্সে রেখে দিল। পরের মাসেই তার জন্মদিন। নীলাম্বরী কাপড় সে স্বচ্ছন্দে কিন্‌তে পারবে। দশ টাকা ত তার রইলই, তা দিয়ে শাড়ী হবে, মা কি আর একটা ভাল জামা তাকে দেবেন না? পারুলকে ঐ রকম শাড়ী একখানা জুটিয়ে দেবার জন্যে ব'লে রাখবে কি না, তাই সুধা ভাব্‌তে লাগল।

জন্মদিন হতে আর সপ্তাহ-খানেক বাকি। সকাল বেলা সুধা শোবার ঘরের সামনের সরু বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তার লোক-চলাচল দেখ্‌ছিল। এই জায়গাটিই তার বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় ছিল।

রাস্তা দিয়ে মস্ত বড় একটা গানের দল চলেছে, কি যে গানের কথাগুলো, সুধা প্রথমে বুঝতে পারল না। কিন্তু অতগুলি মানুষের বেদনামাখা গলার স্বর তার মনটাকে কেমন যেন চঞ্চল ক'রে তুলতে লাগ্‌ল। কি চায় ওরা? কেন অমন ক'রে গান গাইছে?

গানের দল ক্রমে তাদের গলির মধ্যে এসে পড়ল। প্রত্যেক বাড়ীর বারান্দা, জান্‌লার ধার, মানুষে ভ'রে উঠ্‌ল, ছোট ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে গলিতে নেমে গেল। সুধা যেখানে ছিল, সেই-খানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। বাংলা-দেশের অনেকগুলি জেলা বানের জলে ভেসে গেছে, সেখানকার মানুষ না খেয়ে মরছে, কাপড়ের অভাবে গলাজলে

দাঁড়িয়ে থাক্‌ছে, দুঃখে-কষ্টে মা ছেলে ফেলে পালাচ্ছে, বাপ আত্মহত্যা ক'রে মরছে। এদের জন্যে এই গানের দল দেশবাসীর করুণা ভিক্ষা কর্‌তে বেরিয়েছে।

যে যা পারে দিতে লাগল। টাকা, পয়সা পুরনো কাপড়। সুধাও নিজের বাক্সটা একবার খুল্‌ল, তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

ফিরে যখন উপরে এল, মা জিজ্ঞেস করলেন, "কি দিলি রে ?"

সুধা একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "সেই দশ টাকার নোটটা।"

মা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "সে কি রে ? সব দিয়ে দিলি ? কিছু রাখলি না !"

সুধা বল্‌লে, "না মা, দশ টাকায় অন্ততঃ দশ-জন মানুষ ত কাপড় পরতে পারবে ? আমি না হয় জন্মদিনে পুরনো কাপড়ই পর্‌ব।"

চীনে বুদ্ধি

(স্প্যানিশ্ গল্প অবলম্বনে)

চাওসির ভারি দুর্দ্দিন এসে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর ধানের ক্ষেতে ফসল হয়েছিল প্রচুর, চায়ের বাগানে চায়ের সাদা ফুলে ডালপালা সব ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল, রেশমের গুটি যা হয়েছিল, তার চেয়ে ভাল ও-দেশে কারও ছিল না। সম্রাটের হাতে লেখা একখানা চিঠি পর্য্যন্ত তিনি পেয়েছিলেন, তাতে চাওসি যে বহুকাল বেঁচে থাকবেন, তার ইঙ্গিত ছিল। সব চেয়ে সুখের কথা এই যে, তাঁর পরম শত্রু পিকং, যে চাওসির বিনুনী কেটে ফেলে মারাত্মক অপমান করেছিল, তাকে অল্প আগেই ঘাতকে কেটে কুচিয়ে ফেলেছে, এ তিনি নিজের চোখে দে'খে এসেছেন।

তবু তাঁর দুর্দ্দিন কেন, তোমরা জিজ্ঞেষ করতে পার। তা বলা শক্ত। কিন্তু দুর্দ্দিন যে এসেছিল তা ঠিকই, নইলে তিনি অপদেবতা ফোর চীনেমাটী

দিয়ে গড়া মুর্ত্তিটাকে ক'সে ঠ্যাঙাতে হুকুম করবেন কেন ? সেটা ত ভেঙে মাটীতে গড়াচ্ছিল। চাওসি নিজের বুড়ো রাধুনীকে আচ্ছা ক'রে বকুনি দিলেন, যদিও তাঁর অতিথিরা বুড়োর রান্না খেয়ে ধন্য ধন্য করছিল। এক পেয়ালা বহুমূল্য সুগন্ধি চা রাগ ক'রে ফিরিয়ে দিলেন, এমন কি তাঁর পোষা বাঁদরটা এসে যখন তাঁকে আদর করতে লাগল, তখন তাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলেন।

তাঁর তিনটি অতিথি বস্‌বার ঘরের মাঝখানে আসন-পিঁড়ি ক'রে বসেছিলেন। খাওয়া হয়ে যাবার পরে তাঁদের সম্বোধন ক'রে চাওসি বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, আমি আমার ছেলেকে মহামহিম সম্রাটের দরবারে হাজির কর্‌তে ইচ্ছা করি।"

সম্রাটের নাম হবামাত্র বক্তা এবং শ্রোতা সকলেই মাথা নুইয়ে প্রায় মেঝেতে ঠেকিয়ে ফেললেন, এবং বাঁদরটাও তাঁদের দেখাদেখি ঠিক সেই রকম করছিল ব'লে, তাকে বসবার ঘর থেকে দূর ক'রে দেওয়া হল।

চাওসি আবার বল্‌তে লাগলেন, "আমার ছেলে টিকু মোটেই মানুষ হচ্ছে না, যদিও তাকে আমি খুব ভাল শিক্ষা দিচ্ছি। কি রকম ক'রে আঠারবার ঝুঁকে প'ড়ে নমস্কার করতে হয়, তা সে জানে না, আমাদের সভ্য-সমাজের সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় রীতিনীতিও কিছু বোঝে না। লিসিংএর গুণবতী মেয়ে, যার পা দু'খানি বাদামের খোলায় ধ'রে যায়, তাকে কি না সে বিয়ে করতে নারাজ। আর তোমরা শুনে অবাক্ হবে যে চঙ্ যখন তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান ক'রে বল্‌লে যে, সে নিজের পেট কেটে ফেলতে পারে না, তখন টিকু মোটেই এগোল না। চঙ্ দিব্যি তার সামনে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়ে মারা গেল। এর চেয়ে কলঙ্কের কথা আর কি আছে? এখন পরিবারের মান রাখবার জন্যে আমার কি করা উচিত, তোমরা ভেবে-চিন্তে বল। তোমরা যা স্থির ক'রবে, আমি সেই অনুসারে কাজ কর্‌ব।"

অতিথিদের মধ্যে যাঁর বয়স সব চেয়ে বেশী,

তিনি বল্‌লেন, "প্রথমতঃ টিকুকে তোমার ত্যজ্যপুত্র করা উচিত।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, "আমরা পাঁচজন যে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছি, তাদের মধ্যে তোমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দেওয়া উচিত।"

তৃতীয় জন বল্‌লেন, "আমরা সব একগোষ্ঠীর লোক, তোমার ছেলের কলঙ্কে আমাদের সকলের কলঙ্ক হয়েছে। এর প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তোমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত, না হলে গোষ্ঠীর মান থাকে না।"

এই ব'লে আত্মীয়-বন্ধুরা বিদায় হলেন। তাঁদের ডেকে এনে পরামর্শ চাওয়ার জন্যে চাওসি এখন মনে মনে অনুতাপ করতে লাগলেন।

বিকেল বেলা তিনি তাঁর ছোট স্ত্রী টীয়ানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন; তাঁর হাতে একটি হাতীর দাঁতের বাক্স, তাতে নানা রকম সুন্দর ছবি আঁকা।

তাঁর স্ত্রী খুসি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্যে কি নিয়ে এসেছ?"

চাওসি বল্লেন, "এমন জিনিষ যে দেখলে একেবারে অবাক্ হয়ে যাবে।"

টীয়ান শুনে ব্যগ্রভাবে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বস্লেন। চাওসি বাক্সটা বিছানার উপর নামিয়ে রেখে বল্লেন, "তুমি আদর্শ স্ত্রী ছিলে এবং ইতিহাসে যাতে পরম গুণবতী বলে তোমার নাম থাকে, আমি তার ব্যবস্থা কর্তে চাই। আমার পরিবারের মান বজায় রাখার জন্যে একটি বলি দরকার। আমাকে ত মহামহিম সম্রাট্ অনেক কাল বাঁচবার অঙ্গীকার পত্র লিখে দিয়েছেন, কাজেই আমি জোর ক'রে ম'রে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখাতে পারি না। সুতরাং আমি ঠিক করেছি, তোমার উপরেই এই গৌরবজনক কাজের ভার দেব। এই বাক্সের মধ্যে এক গাছা রেশমের দড়ি পাবে। ওটা গলায় দিয়ে ম'রে তুমি আমাদের মান রক্ষা কর।"

টীয়ান্ অত্যন্ত ভয় পেয়ে বল্লেন, "প্রভু, আমি অত্যন্ত ভীতু, নিজে নিজেকে মারতে কিছুতেই পারব না।"

চাওসি বললেন, "এমন জিনিষ যে দেখলে একেবারে অবাক্ হয়ে যাবে।"

চাওসি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, "ভয় পেয়ো না। যদি নিজে না পার, তা হলে বুড়ো রাঁধুনিটাকে ডেকো, সে তোমায় সাহায্য কর্‌বে।" এই ব'লে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টীয়ান্ বুড়ো কিন্‌কে ডেকে পাঠালেন। সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এসে হাজির হল।

টীয়ান্ বল্‌লেন, "তোমার একটু বিশ্রাম দরকার।"

কিন্ চোখ রগ্‌ড়াতে রাগ্‌ড়াতে বল্‌লে, "আমার রাত্রে মোটে ঘুম হয় না।"

টীয়ান্ বললেন, "তুমি খুব গুণের চাকর। পরলোকে তোমার জন্যে যে পুরস্কার অপেক্ষা ক'রে আছে, তা পাবার জন্যে নিশ্চয়ই তুমি ব্যস্ত আছ?"

কিন্ বল্‌লে, "বুদ্ধদেব আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন, তা ত জানি না ঠাকরুন্।"

টীয়ান্ বল্‌লেন, "তা দেখ, তোমায় একটা কাজের জন্যে ডেকেছি। আমার স্বামীর আদেশে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। পরলোকে

একেবারে একলা কি ক'রে যাব ভেবে ভয় পাচ্ছি। তুমিও যদি আমার সঙ্গে এস, তা হলে ভাল হয়; একজন চেনাশোনা বিশ্বাসী লোক কাছে থাকে। এখানে ত কর্ত্তা তোমার উপর সন্তুষ্ট নন, সেদিন তোমার রান্না ঠেলে সরিয়ে দিলেন। এখানে থেকে কি ক'র্‌বে?"

কিন্‌ বেচারার ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল। টীয়ান বল্‌লেন, "ভেবে দেখ। ওখানে ভালই থাকবে। রাজি হও যদি, তা হলে এই দড়িটা নিয়ে ঝুলে পড়। আমি নিজের গহনাগাঁটি নিয়ে আস্‌ছি, তারপর গলায় দড়ি দেব।"

কিন্‌ কিছু বলে না দেখে, টীয়ান্‌ বাক্স থেকে রেশমের দড়িটা বার ক'রে, তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। বল্‌লেন, "আচ্ছা, ঐ জানলার বাইরে গিয়ে গরাদেতে বেঁধে ঝুলে পড়। আমিও এলাম ব'লে।"

কিন্‌ ঘর থেকে বার হয়ে যেতে যেতে, বাইরের বারান্দায় একটা শব্দ শুন্‌তে পেল। "বাঁদরটা জিনিষপত্র উল্টোচ্ছে"—ব'লে কিন্‌ এগিয়ে চল্‌ল,

আর মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "আমার দুই কারণে আত্মহত্যা করা উচিত নয়। এক ত ম'রে আর জন্মাব কিনা তার কোনও ঠিকানা নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমি প্রভুর আদেশে সেদিন অপদেবতা ফোর মূর্ত্তি ঠেঙিয়ে ভেঙেছি। পরলোকে আমায় হাতে পেলে হয়ত সে শোধ তুলবে। কাজ নেই বাবা, সেখানে গিয়ে, বেশ আছি"—এই ব'লে সে গলা থেকে ফাঁশটা খুলে ফেল্‌ল।

বারান্দায় আবার শব্দ হ'ল। কিন্ যদিও পোষা বাঁদরটার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিল, কিন্তু সে বেচারার কোনও দোষ ছিল না। চাওসির গুণবান্ ছেলে টিকু বাপের লোহার সিন্ধুক খুলে ধনরত্ন সব চুরি করছিলেন, তারই এই শব্দ। পাশের জান্‌লাটা খোলা ; এটা বেয়ে নাম্‌লে, একেবারে বাগানের মধ্যে নেমে পড়া যায়। একটা বেশ বড় থলি মণি-মুক্তায় বোঝাই হয়ে উঠেছিল। থলির ভিতর থেকেও সেগুলি ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বল্‌ছিল।

কিন্ অনেক কালের পুরনো চাকর। সে এই ব্যাপার দে'খে অত্যন্ত চ'টে গেল এবং টিকুকে

বক্‌তে আরম্ভ করলে, "একে ত ভীরুতার জন্যে বাপের বংশে কালি দিয়েছ, তার উপর আবার চুরি !"

টিকু বল্‌লে, "আরে চুপ কর, এখনই কেউ শুন্‌তে পাবে।" কিন্তু কিনের একবার মুখ ছুটেছে, আর কি সে থামে ? সে আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগ্‌ল।

তখন টিকু বেজায় ভড়্‌কে গেল। বল্‌লে, "আচ্ছা, রেশমের ফাঁসটা আমায় দাও। পরিবারের নামে কলঙ্ক যখন আমিই দিয়েছি, তখন মরা উচিত আমারই।"

কিনের আপত্তি ছিল না, সে তাড়াতাড়ি রেশমের দড়িটা টিকুর গলায় পরিয়ে দিল। দড়ির একটা দিক্ জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধে টিকু ঝুলে পড়তে চল্‌ল। কিন্তু প্রথমে ধনরত্নের বোঝাটা কাঁধে ফে'লে নিল। কিন্ অবাক্ হয়ে গিয়েছে দে'খে বল্‌লে, "অনেক দূরের পথ, খরচার জন্যে কিছু সঙ্গে নিতে হবে ত ?"

কথাটা কিনের ঠিক বিশ্বাস হল না। যা হোক্

সে কিছু বল্‌ল না। টিকু জানলার উপর উঠে ব'সে বল্‌লে, "তুমি এখান থেকে চ'লে যাও, আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখলে, তোমার ভয়ানক কষ্ট হবে।"

কিন্ সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলল। বাগানে ঢুক্‌তে যাবে, এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার একটা বিকট শব্দ আর একটা যন্ত্রণাসূচক চীৎকার শুন্‌তে পেল। তার একটু সন্দেহ হল। গলায় দড়ি দেবার ভান ক'রে, ছোক্‌রা শেষে ধনরত্ন নিয়ে চম্পট দিল নাকি? কিন্ তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে ঢুক্‌ল।

জান্‌লার থেকে একটা দেহ ঝুলছে, সে দেখতে পেল। নীচে মাটীতেও কি একটা যেন নড়ছে, কিন্ ঠিক বুঝতে পারল না। যাই হোক্, নিজের ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে সে ভাবলে, "যাক্ হতভাগা মরেছে! টিয়ান্-ঠাক্‌রুন্‌কে ত আর একলা পড়তে হবে না, সতীনপো গিয়ে জুট্‌ল ব'লে।"

সে নিজের ঘরে গিয়ে দিব্যি ক'রে আফিং টেনে ক'ষে ঘুম দিল।

পরদিন সকালে, চাওসির বাড়ী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে ভ'রে গেল। সকলের পরণে শাদা পোষাক, এইটাই চীনদেশে শোকের চিহ্ন। সকলে চাওসির মৃতদেহের কাছে শেষ উপহার দিতে এসেছেন। কিন্তু চাওসি নিজেই যখন শাদা পোষাক প'রে, গম্ভীর মুখে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁরা একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। একজন অত্যন্ত চ'টে বল্‌লেন, "তুমি বেঁচেই আছ? হায়, হায়, আমাদের আর মান থাকল না।"

চাওসি তখন সব কথা খুলে বল্‌লেন। সম্রাট্ তাঁকে বাঁচবার অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিয়েছেন, তিনি কি ক'রে মরতে পারেন? স্ত্রীকে বলেছিলেন, সে ভয়ে মরতে পারল না। বুড়ো কিনের দ্বারাও কাজ হল না, শেষে তাঁর অপরাধী ছেলে স্বেচ্ছায় গলায় দড়ি দিয়ে, সব গোলমাল চুকিয়ে দিয়েছে। আত্মীয়-বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধ'রে তর্ক-বিতর্ক কর্‌লেন, পরে ঠিক হল যে, টিকু মর্‌লেই চল্‌বে।

তখন চাওসি আত্মীয়দের বললেন, "এস,

রেশমের দড়ি গলায় দিয়ে একটা দেহ ঝুল্‌ছে বটে কিন্তু দেহটা একটা বাদরের।

বাগানে যাওয়া যাক্। সেখানে এখন পর্য্যন্ত কেউ যায় নি। আমরা হতভাগ্য টিকুর মৃতদেহ নামিয়ে আনব।"

সকলে সার বেঁধে তাঁর পিছন পিছন চল্‌লেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবামাত্র সবাই একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। রেশমের দড়ি গলায় দিয়ে একটা দেহ ঝুল্‌ছে বটে, কিন্তু দেহটা একটা বাঁদরের।

চাওসি বিস্মিত হয়ে বললেন, "এ আমার ছেলে নয়।"

কিন্‌কে ডাকা হল। সে এসে বললে, "প্রভু, আমি নিজের চোখে দেখলাম, তিনি দড়ি গলায় দিলেন। নিশ্চয় এই বাঁদরটা আপনার ছেলের রূপ ধরেছে, আর নিজের দেহটা এখানে রেখে গেছে। এখানে কোনও একটা মায়ামন্ত্রের কাণ্ড চলেছে। ফো এমনি ক'রে প্রতিশোধ নিচ্ছে বোধ হয়, তাঁর মূর্ত্তি আপনি ঠেঙিয়ে ভেঙেছেন কিনা।"

টিকু মারা গেলে চাওসির উত্তরাধিকারী হন্

আত্মীয়েরা, কারণ চাওসির আর ছেলে-পিলে নেই। তাঁরা একবাক্যে ব'লে উঠলেন, "মোটেই তা নয়। এই ত টিকু! দেখ্ছ না বাপের চেহারার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য?"

চাওসি অত্যন্ত চ'টে বললেন, "আমার চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য? ওর মুখ-খানা দেখ দেখি ভাল ক'রে?"

আত্মীয়েরা আবার একবাক্যে ব'লে উঠ্লেন, "অবিকল তোমার মত মুখ, চাওসি।"

চাওসি বললেন, "ওর কান-দুটো দেখ।" আত্মীয়েরা বললেন, "ঠিক তোমার মত।"

চাওসি আবার গোলমাল কর্বার উপক্রম করতেই, একজন তাঁর কানে কানে বল্লেন, "একজনের মরা ত দরকার? কেন মিছে গোলমাল করছ? চুকে যেতে দাও না?"

চাওসি অবশেষে বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেন যে দেহটা তাঁর ছেলেরই, যদিও দেখতে অনেকটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

টিকু মারা গিয়েছে ব'লে সরকারি আফিশ্

থেকে লিখে দেওয়া হল। বাঁদরের দেহটা নিয়ে বিপুল সমারোহ ক'রে কবর দেওয়া হল। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই স্বীকার করলেন যে পরিবারের মান-রক্ষা হয়েছে, আর কোনও কলঙ্ক নেই।

চাওসিকে যদিও মহামহিম সম্রাট্ দীর্ঘ জীবন উপভোগ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবুও তিনি আর খুব বেশী দিন বাঁচলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর একটি যুবক এসে তাঁর সম্পত্তি দাবী করল। সে বল্‌লে, তার নাম টিকু, এবং সে কয়েক বছর আগে জানলা বেয়ে বাপের বাড়ীর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

আত্মীয়েরা কেউ তাকে টিকু ব'লে মান্‌তে চায় না, শেষে আদালতে মোকদ্দমা স্বরু হল। দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে একজন বিচারপতি এই রায় দিলেন ঃ—

"টিকুর মৃত্যু হয়েছে ব'লে সরকারি আদালত থেকে লিখে দেওয়া হয়েছে। এই যুবক যে-দিন চাওসির বাড়ী থেকে পালিয়েছিল ব'লে বল্‌ছে, সেই দিন কেবলমাত্র একটা বাঁদর ঐ বাড়ী

থেকে পালিয়েছিল ব'লে জানা যায়। সে বাঁদরটা কোথায় গিয়েছে, কেউ তা জানে না। যদি এই যুবক উক্ত রাত্রে চাওসির বাড়ী থেকে সত্যি পালিয়ে থাকে, তা হলে এ সেই বাঁদর, আর কেউ নয়। আর এ যদি মিথ্যা কথা ব'লে থাকে, তা হলে সেই অপরাধে একে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।"

টিকু বেচারা দেখলে, উভয় সঙ্কট। ফাঁসী যাওয়ার চেয়ে সে নিজেকে বাঁদর ব'লেই মেনে নিল। একটা বাঁদর-নাচওয়ালার কাছে কয়েক টাকা নিয়ে তার আত্মীয়েরা টিকুকে বিক্রী ক'রে দিলেন। তারপর তাঁরা মনের আনন্দে চাওসির সব সম্পত্তি উপভোগ করতে লাগলেন।

মাটির মায়া

তরঙ্গিণী ব'লে মস্ত বড় এক নদী, তার ধারে ছোট একখানি গ্রাম। নিতান্তই ছোট, বড় জোর একশ' ঘর লোকের বাস। তার ভিতর অধিকাংশই গরীব—চাষী, ক্ষেতের ফসল, বাগানের তরি-তরকারির উপরেই তাদের নির্ভর। এদের ভিতর এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের চুলে পাক ধরেছে, অথচ তারা সহর কি-রকম তা চোখে দেখেনি, রেলগাড়ী কি জিনিষ, তা জানেও না, বর্ণনা ক'রে বুঝিয়ে বল্‌তে গেলে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে।

এই গ্রামে একটি মেয়ে থাকে, তার নাম অমলা। মা, বাবা বা ভাই-বোন বল্‌তে তার কেউ নেই। অনেক বছর আগে এক ভীষণ মহামারীতে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক মারা যায়, সেই সময় অমলারও আত্মীয়-স্বজন যে কেউ ছিল, সকলেই

চ'লে যায়। সে শুধু বেঁচে আছে, তাদের ছোট বাড়ীটিতে। গ্রামেরই এক বুড়ী রাত্রে এসে তাকে আগ্‌লায়, সারাটা দিন অমলার একলাই কেটে যায়। কিন্তু সময় কাটাবার জন্যে তাকে ভাবতে হয় না। সুন্দর একটি বাগানের মধ্যে তার কুঁড়েখানি, মাটির দেওয়াল, সোনালী রঙের খড় দিয়ে ছাওয়া। বাগানের চারদিক্ ঘিরে বাঁশের বাখারির বেড়া, কিন্তু বাখারি একখানিও দেখবার জো নেই, ঝুম্‌কো লতায় তার সবটাই ঢাকা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, চারধার জুড়ে ফুলের পরদা দোলান রয়েছে। ঘরের সামনে ফুলের বাগান, পিছনে তরি-তরকারির বাগান। এই-সবের তদারক করতে অমলার সারাটা দিন কেটে যায়, মন ভার ক'রে ব'সে থাকবার কোনই অবসর সে পায় না। এতেই তার খাওয়া-পরাও চলে, পাড়া-গাঁয়ে খরচই বা কি? ভিন্‌গাঁয়ের ব্যাপারীরা এসে ফুল-ফল-তরকারি সব নগদ দাম দিয়ে কিনে নেয়, দূরের সহরে গিয়ে চড়া দামে সব বিক্রী করে। অমলার দরকার মত গ্রামের হাট থেকে সে চাল-

ডাল-মশলা কেনে, তাঁতির কাছে মোটা সূতোর হাতে-বোনা রঙীন শাড়ী কেনে, আবার দু'চার পয়সা গরীব-দুঃখীকে দানও করে। বিলাসিতা কা'কে বলে সে জানেই না, কাজেই তার অভাবে দুঃখও করে না। হাতে, গলায়, চুলে ফুলের মালা দুলিয়ে সে যখন বাগানে ঘুর্‌ঘুর্‌ ক'রে বেড়ায়, তখন বনদেবীরাও তার রূপ দে'খে হিংসা করেন, মণিমুক্তার গহনা পরা রাজকন্যারাও তার সৌন্দর্য্যের কাছে হার মানেন।

দিন কেটে যায়। গ্রামের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য কিছু নেই, তবু এটা গ্রামের লোকের কাছে একঘেঁয়ে লাগে না, তারা চিরকাল এতেই যে অভ্যস্ত? নূতন ধরণের কিছু তারা চায় না, তাদের এই শান্তিময় জীবনই তাদের সব চেয়ে ভাল লাগে।

হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলা গ্রামে সাড়া প'ড়ে গেল। ছিদাম তাঁতির চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যার সময় একলা সে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ

তাকে চোখে দেখেনি। গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল। কি হল মেয়ে, কোথায় গেল? এ গাঁয়ে কেউ কারো দুষমন্ নেই, সবাইকার সঙ্গে সবাইকার ভাইয়ের মত সম্বন্ধ, এখানে একজন আর-একজনের অনিষ্ট কর্‌বে কেন? আর কিসের জন্যেই বা করবে? ছিদাম গরীব মানুষ, তার মেয়ের গায়ে কিছু সোনাদানা নেই। কিসের লোভে মানুষ তার ক্ষতি কর্‌বে?

গ্রামের লোক যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজি কর্‌লে, গ্রামের চৌকিদারকেও খবর দেওয়া হল, কিন্তু ফল কিছু হল না। মেয়েটি মামার বাড়ী যেতে খুব ভালবাস্‌ত, সেখানেও লোক গেল খোঁজ কর্‌তে, সেখানে সে যায়নি। দিনের পর দিন কেটে চল্‌ল, তারপর কখন একদিন লোকে ছিদামের মেয়ে পার্ব্বতীর কথা ভুলে গেল। সংসারের নিয়মই এই যে এখানে কোনও কথাই মানুষে বেশী দিন মনে রাখে না।

কয়েকটা মাস কেটে গেছে, শীতকাল চ'লে গিয়ে বসন্তকাল এসে পড়েছে। ফুলের গন্ধে বাতাস

ভরপূর, নূতন পাতার সবুজ রঙে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। পাখীরা ঝাঁক বেঁধে যেন দেশ বেড়িয়ে বাড়ী ফিরেছে, তাদের মিষ্টি স্বরে সমস্ত দিক্‌ যেন উৎসবময় হয়ে উঠেছে।

দোল-পূর্ণিমায় গ্রামে ভারি আনন্দ, এইটাই তাদের সব চেয়ে বড় পর্ব্ব। সেদিন ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ কেউ ঘরে থাকে না। আবীরের রঙে গ্রামের পথের ধূলো রাঙা হয়ে ওঠে, রঙে রঙে সব-ক'টি মানুষের কাপড়-চোপড়ের যা শ্রী হয়, রামধনুও তার কাছে হার মেনে যায়। ফুলের শোভা সেদিন শতগুণ বেড়ে ওঠে, পাখীর কণ্ঠে সেদিন স্বরের ঝরণা নেমে আসে। খাওয়া-দাওয়ার কথা কেউ মনেও করে না, বাড়ীর দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সূর্য্য ডুবতে না ডুবতে সোনার থালার মত মস্ত বড় চাঁদ আকাশে আবার আলোর বান ডাকিয়ে উঠে আসে, ঘরে যাবার কিই বা দরকার? রাতটাও প্রায় নৃত্যগীতের উৎসবেই কেটে যায়।

পূর্ণিমার রাত্রি-শেষে উৎসব-ক্লান্ত শরীর নিয়ে

অমলা তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। একটু ঘুম তার নিতান্ত দরকার। পূবের দিকে চেয়ে দেখলে, আকাশ ঝিনুকের বুকের মত স্বচ্ছ আলোয় ভ'রে উঠ্‌ছে, সকাল হতে খুব বেশী আর দেরি নেই। এখন কি আর ঘুমনো চল্‌বে? কাল সারাদিন বাগানে হাত পড়েনি, আজও কি গাছপালাগুলিকে অবহেলা করা চলে? অযত্নে ম'রে যাবে যে! না, আর এখন ঘুমবার সময় নেই। অমলা জোর ক'রে সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফে'লে কাজে লেগে গেল। ঘরে ঢুকেই উৎসবের রঙে চোবান কাপড় ছেড়ে ফে'লে, শাদা একখানি শাড়ী প'রে জলের কলসীটি তুলে নিল। তরঙ্গিণী নদীর জলেই গ্রামের সকলের সব কাজ চলে, এমন কি অত বড় বাগানে জল দেবার জলও অমলা কল্‌সী ক'রে নদী থেকে বয়ে নিয়ে আসে। নদীটা খুবই কাছে, তাই তার বিশেষ কষ্ট হয় না। অমলা কল্‌সী নিয়ে আস্তে আস্তে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

ওমা, ঘাটের সিঁড়ির ধারে ও কে ব'সে?-বসবার ভঙ্গিটা ঠিক যেন ছিদামের মেয়ে পার্ব্বতীর মত।

সেই নাকি ? ভোরের আধ-আলো, আধ-অন্ধকারে ভাল ক'রে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, পিঠ ভরা চুলের আড়ালে শরীরও যেন ঢাকা প'ড়ে গেছে। অমলা তাড়াতাড়ি পা ফে'লে এগিয়ে চল্‌ল, পার্ব্বতী হলে কি মজাই হয়। প্রায় বছর ঘুরে আস্‌তে চল্‌ল, এতদিন মেয়ে কোথায় ছিল কে জানে ?

সত্যিই ত পার্ব্বতী ! অমলা চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ রে পার্ব্বতী, কোথায় ছিলি এতদিন ? সবাইকে কি ভোগই না ভোগালি !"

মেয়েটি আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে অমলার দিকে চাইল। পার্ব্বতীই ত বটে, কিন্তু অমলাকে যে কিছুমাত্র চিনেছে ব'লে ত বোধ হচ্ছে না ? অমলা আবার বল্‌লে, "কি রে, আমায় চিন্‌তে পারছিস্ না ? আমি যে অমলা। আট-ন'মাসের মধ্যেই ভুলে গেলি ?"

মেয়েটি দুই চোখে বিস্ময় ভ'রে অমলার দিকে চেয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে ?"

অমলা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বললে, "আমি কে চিনিস্ না ? আমি তোর দিদির সই অমলা,

আমার ঘর ঐ যে দেখা যাচ্ছে”—ব’লে আঙুল দিয়ে নিজের ঘর দেখিয়ে দিলে।

পূবের আকাশ লাল টক্ টক্ করছে, সূর্য্য উঠে পড়্‌ল ব’লে। অমলা বললে, “আচ্ছা ন্যাকা মেয়ে, সত্যি বলছিস্ আমায় চিন্‌তে পারছিস্ না? আচ্ছা, তোর মাকে ডেকে আনি, দেখি চিনিস্ কি না। এতদিন কোথায় ছিলি?”

পার্ব্বতী বললে, “কে জানে, মনে নেই।” অমলা এবারে সত্যিই বেশ অবাক্ হল। এ আবার কি রকম কাণ্ড? পার্ব্বতী কি পাগল হয়েছে? নইলে চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে কখনও সব-কিছু ভুলে যেতে পারে? সে সকলকে খবর দেবার জন্যে জলের কলসী ভ’রে নিয়ে তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে চল্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নদীর ঘাটের কাছে ভীড় জ’মে গেল। সবার আগে ছুটে এল পার্ব্বতীর মা, বাবা, ভাই-বোন সকলে। পার্ব্বতীকে ফিরে পেয়ে কি আনন্দ তাদের। সবাই মিলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কত প্রশ্ন যে করতে লাগল, তার ঠিকানা নেই।

পার্ব্বতী কিন্তু কোনও কথার জবাব দিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল।

পার্ব্বতী কিন্তু কোনও কথার জবাব দিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। কথা ব'লে ব'লে এবং উত্তর না পেয়ে হয়রান হয়ে শেষে পার্ব্বতীর মা-বাবা তাকে নিয়ে বাড়ী চ'লে গেলেন। গাঁয়ের লোক এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলাবলি কর্‌তে কর্‌তে যে যার কাজে চ'লে গেল।

পার্ব্বতী আর কোনও দিন আগেকার স্মৃতি ফিরে পেল না। তবে নিজের পরিবারের লোকদের সঙ্গে আবার সে নূতন ক'রে পরিচয় ক'রে নিল, কাজেই কাজ চল্‌তে লাগল, কোনও অসুবিধা হল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা সকলের সয়ে গেল।

বসন্তকাল কেটে গ্রীষ্মের দিন এসে পড়ল। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝ'রে পড়্‌ছে, বাইরের দিকে তাকাবারও জো নেই। তাও দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গিয়ে পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটাবার জন্য মুষলধারে বৃষ্টি নামতে লাগল। পথ, ঘাট, মাঠ—সব জলে জলময়। তরঙ্গিণীর তরঙ্গ আরও উত্তাল হয়ে উঠ্‌তে লাগল, ক্রুদ্ধ অজগরের মত সে কেবল

ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। গ্রামের লোক বন্যার ভয়ে কাতর, না জানি কখন কি সর্ব্বনাশ হয়।

এমনই একটি বর্ষার সন্ধ্যায় অমলা সাবধানে পা ফে'লে কলসী নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে নদীর ঘাটে। এখনও দিনের আলো যেটুকু আছে, তারই মধ্যে কাজ সেরে তাকে ফিরে যেতে হবে, তাই যতদূর পারে তাড়াতাড়ি সে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারটা তার মনের ভিতরটাকেও যেন আঁধার ক'রে দিয়েছে।

ঘাটে সর্ব্বদাই খেয়া নৌকা বাঁধা থাকে, ওপারের গাঁয়ের সঙ্গে এই নৌকার সাহায্যেই যোগ রাখতে হয়। অমলা দেখলে, নৌকার পাশে পা ঝুলিয়ে ব'সে একটি মেয়ে, তারই মত বয়স হবে। এমন সময় নৌকায় ব'সে মেয়েটি কি করছে জানতে অমলার একটু কৌতূহল হল, সে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি ওখানে কি কর্‌ছ গা?" মেয়েটি বল্‌লে, "আমি শাঁখা, চুড়ি বেচ্‌তে এসেছি। ভারি সুন্দর সুন্দর চুড়ি আছে আমার কাছে, তুমি নেবে?"

"দেখি কেমন চুড়ি ?" বলে অমলা ঘাটের সিঁড়ি ক'টা নেমে নৌকার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি সবলে এক টান দিয়ে মেয়েটি তাকে নৌকায় তুলে নিল, আর নৌকাও তর্‌তর্ ক'রে চল্‌তে আরম্ভ করল।

অমলা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, কিন্তু কেই বা তার কান্না শুন্‌ছে ? নৌকাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঝ-নদীতে এসে পড়ল। ঘাটে সে-সময় আর কেউ ছিল না, কাজেই অমলার অপহরণের কথা কেউই জান্‌তে পারল না। অমলা অবাক্ হয়ে দেখল, যে-মেয়েটি তাকে নৌকায় টেনে তুলেছিল, সে আর নৌকায় নেই, তার বদলে কয়েকজন অদ্ভুত চেহারার এবং অদ্ভুত পোষাক-পরা নাবিকের মত মানুষ দাঁড় টান্‌ছে। নৌকাটাও গেছে একেবারে বদ্‌লে। সেই শ্যাওলা-ধরা কাঠের খেয়া নৌকা আর নেই, মস্ত বড় শাদা ধব্‌ধবে জাহাজ, পাল তুলে দিয়ে বাজপাখীর মত উড়ে যাচ্ছে। কোথায় অমলাকে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে ? ভয়ে অমলার বুক কাঁপ্‌তে লাগল, কিন্তু

কৌতূহলও কম হল না। কে এরা? কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে? কেন নিয়ে যাচ্ছে? যে লোকটা হাল ধ'রে ছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

লোকটি বল্‌লে, "দেখ্‌তেই পাবে। তোমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই।" ব'লেই সে আবার নিজের কাজে মন দিল। অমলা বুঝল, সে ব্যক্তি তার আর কোনও কথার জবাব দেবে না, কাজেই আস্তে আস্তে সে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। লোকটি তাকে যদিও আশ্বাস দিল, তবু অমলার ভয় গেল না। বাপ, মা, ভাই-বোন কেউ তার নেই, কাজেই কাউকে ছেড়ে যেতে যে তার মন কাঁদছিল তা নয়, তবু নিজের অদৃষ্টে কি না জানি আছে, তারই আশঙ্কায় তার বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠ্‌ছিল।

গভীর রাত্রি নেমে এল, জলের রং যেন কালির মত কালো হয়ে উঠ্‌ল। নাবিকদের ভিতর একজন পথ দেখিয়ে অমলাকে জাহাজের একটি কামরার

ভিতরে নিয়ে গেল। সেটি এমন সুন্দর ক'রে সাজান যে দেখলে দুদণ্ড খালি চেয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। শাদা একটি পাথরের টেবিলের উপর থরে থরে কত রকম সুন্দর, সুগন্ধ খাবার সাজান! অমলা কিন্তু সে-সব কিছু ছুঁলও না। চুপ ক'রে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনে খুব উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও খানিক পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম যখন ভাঙল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে সে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। এ কি, তারা কি সমুদ্রে এসে পড়েছে না কি? চারিদিকে থৈ থৈ করছে নীল জল, ডাঙ্গার চিহ্নও দেখা যায় না। অমলা বিছানা ছেড়ে বাইরে ছুটে গেল। না, সমুদ্র নয় বটে, তবে তারই কাছাকাছি,—প্রকাণ্ড এক নদী। তাদের গ্রামের তরঙ্গিণী নদীকে তারা বড় ব'লে জান্‌ত, এর কাছে সেটা ত নর্দ্দমার মত। দূরে, অনেক দূরে, আকাশের কোলে নীল রেখার মত গাছের সারি যেন দেখা যাচ্ছে। তাহলে ঐখানেই যাচ্ছে তারা? ওটা কাদের দেশ?

নাবিকরা আবার অমলাকে খাওয়াবার চেষ্টা করল, অমলা কিন্তু দু-এক-টুকরা ফল ছাড়া আর কিছু ছুঁলও না। বার বার ক'রে তাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, কেন নিয়ে যাচ্ছ?" কিন্তু উত্তর কিছুই পেল না।

বর্ষার সকালের মেঘলা কেটে গিয়ে, এক ঝলক রোদ নদীর জলের উপর এসে পড়ল। জলটা ঠিক ইস্পাতের খাঁড়ার মত ঝক্‌মক্ করতে লাগল, সেদিকে তাকালে চোখ ঠিক্‌রে যায়। দূরের সেই গাছের সার ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, জাহাজটা সেদিকেই চলেছে। ক্রমে প্রাসাদের ছাদ, মন্দিরের চূড়া, পাহাড়ের মাথা এক-এক ক'রে দিগন্তের গায়ে ফুটে উঠতে লাগল। অমলারা প্রকাণ্ড এক নগরের দিকে এগিয়ে চলেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ে গেল। সেখানে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে, হাতী, ঘোড়া, রথ, চতুর্দ্দোলা কত কি নিয়ে। পোষাক তাদের হাজার রঙে রঙীন, ধরণটা নূতন। এ ধরণের পোষাক অমলা আগে কখনও দেখেনি। দেশটাও
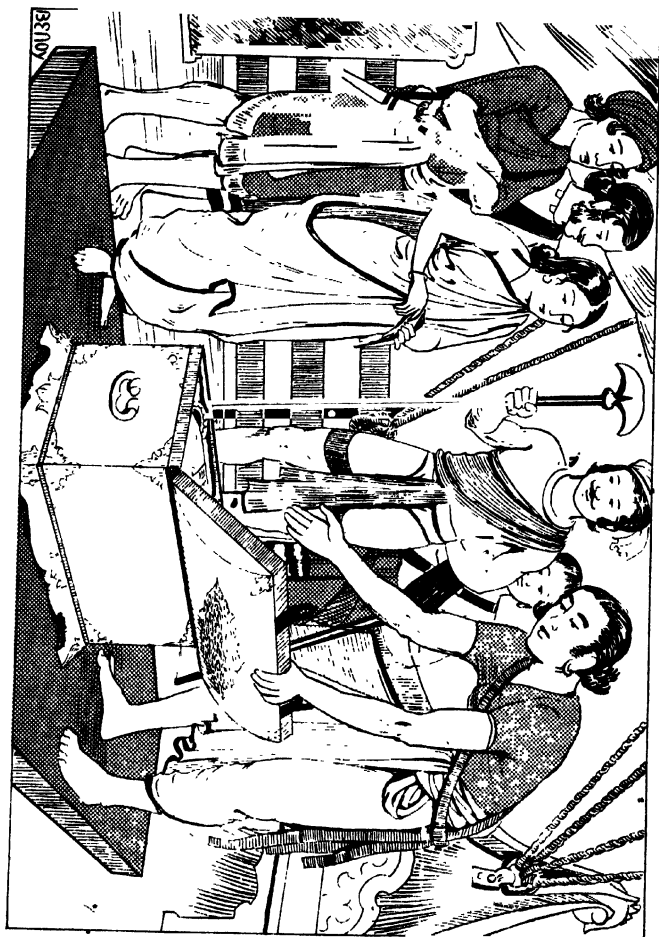
অমলার সামনে বাক্সটা নামিয়ে সে ডালাটা তুলে ধরল

অদ্ভুত সুন্দর, ঠিক যেন স্বপ্নের দেশ, নয় ত উপ-কথার দেশ। সব জিনিষই চেনা চেনা লাগে অথচ ঠিক চেনা নয়। সাধারণ জিনিষকে নিপুণ চিত্রকরের আঁকা রঙীন ছবিতে যেমন অসাধারণ দেখায়, এ যেন সেই রকমেরই। অমলা হাঁ ক'রে এই অপূর্ব্ব দেশের দিকে চেয়ে রইল।

ছোট একটা নৌকায় চ'ড়ে একজন মানুষ জাহাজে এসে উঠ্‌ল, তার সঙ্গে সাদা রঙের একটা সিন্ধুক, সেটা হাতীর দাঁতের কি পাথরের, তা কে জানে? অমলার সামনে বাক্সটি নামিয়ে সে ডালাটা তুলে ধর্‌ল। ভিতরে একটি পোষাক, আর কতক-গুলি গহনা। সে শাড়ীর আর গহনার রূপ দে'খে অমলার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। এটা কাদের দেশ? সত্যিই কি অমলা উপকথার দেশে এসে পড়েছে? এত সুন্দর জিনিষ সত্যিকার জগতে কি থাকে?

লোকটি বল্‌লে, "আপনি পোষাক বদলে নিন, মহারাজ তীরে অপেক্ষা করছেন।"

অমলা অবাক্ হয়ে বল্‌লে, "মহারাজ কেন

আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন ? আর আমি এত দামী সব জিনিষ তোমাদের কাছ থেকে নেব কেন ? আমি ত তোমাদের চিনি না ?"

লোকটি বল্‌লে, "আপনি আমাদের মহারাণী হবেন। রাজ্যে যত ধনরত্ন আছে, সবই ত আপনার।"

অমলা এতই অবাক্ হয়ে গেল যে, তার মুখে কোনও উত্তর জোগাল না। কোথাকার পাড়া-গাঁয়ের গরীব মা-বাপ-ছারা মেয়ে সে, সে হবে কিনা এই আশ্চর্য্য সুন্দর দেশের রাণী ? এ যে শুন্‌লেও বিশ্বাস হয় না। অমলা কি স্বপ্ন দেখছে, না জেগে আছে ? নিজেকে খুব জোরে চিমটি কেটে, চোখ দুটো খুব ভাল ক'রে ঘ'ষেও অমলা কিন্তু এই স্বপ্নটা ভাঙ্গতে পারল না। অগত্যা তাকে স্বীকার করতে হল যে সে জেগেই আছে।

তীরের লোক-লস্কর ক্রমেই অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌ছে বোঝা গেল। অমলার আর দেরি করতে সাহস হল না। সে শাড়ী, জামা আর গহনা নিয়ে তাড়াতাড়ি কাম্‌রার ভিতর ঢুকে গেল, পোষাক

বদ্‌লাতে। নূতন সাজে সেজে সে যখন দেওয়ালে টাঙান বড় আয়নাটার দিকে তাকাল, তখন আর নিজের আগের চেহারা খুঁজে পেল না। সেও যেন এর মধ্যে এ দেশের মানুষগুলির মত হয়ে গেছে। মনটা তার কেমন যেন একটা অদ্ভুতভাবে ভ'রে উঠ্‌ল।

অমলা বাইরে এসে দাঁড়াতেই, তীরের লোকেরা জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল। মস্ত বড় সোনার রথ ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। জাহাজ থেকে তীরে নামবার জন্য হড়্‌হড়্‌ করে সিঁড়ি নেমে গেল। নাবিকেরা তার উপর পেতে দিলে লাল মখমলের আস্তরণ। অমলা আস্তে আস্তে তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সোনার রথে উঠে পড়ল। সমুদ্রের ফেনার মত শাদা ঘোড়া চারটে এতক্ষণ অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে পা ঠুক্‌ছিল। তারা এইবার ছুটে চল্‌ল বাতাসের আগে আগে, পিছন পিছন চল্‌ল আরও যত সব রথ, ঘোড়া, হাতী আর মানুষের দল।

রথ গিয়ে থামল মস্ত এক প্রাসাদের সামনে।

শাদা আর রঙীন পাথর মিলিয়ে প্রাসাদটি গড়া, তার আনাচে-কানাচে সোনা-রূপো-মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি। পথ-ঘাট সব রূপোর, গাছপাতা-ফুল-ফল এমন ঝক্‌মক্ কর্‌ছে যে সেগুলিও যে মণি-মাণিক্য দিয়ে গড়া, তা বুঝতে দেরি হয় না। প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে, রথ এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড এক মর্ম্মর-পাথরের সিঁড়ির সারির সামনে। সেইখানে এই দেশের রাজা দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর নূতন রাণীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

অমলা মহারাজের দিকে চেয়ে দেখলে। এখানের সবই সুন্দর, মহারাজ যেন সব চেয়ে সুন্দর। মাথায় তাঁর হীরার মুকুট, হাতে হীরার রাজদণ্ড। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তিনি অমলাকে হাত ধ'রে রথ থেকে নামিয়ে নিলেন।

দু'জনে মিলে প্রাসাদের ভিতর ঢুকে সব ঘর-গুলি আর তার আশ্চর্য্য সুন্দর গৃহসজ্জাগুলি দে'খে দে'খে বেড়াতে লাগলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "অমলা, তোমার ঘর পছন্দ হয়েছে? এই বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগ্‌বে?"

অমলা বল্‌লে, "বাড়ীটা ত খুব সুন্দর, তবে এখানে থাকতে ভাল লাগবে কিনা জানি না।"

মহারাজের সুন্দর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল, তিনি অমলাকে প্রাসাদের আর-এক দিকে নিয়ে চল্‌লেন। এটা তাঁদের ধনাগার, এখানে রেশম, কিংখাব, মখমলের ছড়াছড়ি, মণি-মুক্তা-হীরা চারিদিকে গড়াচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ যত ঐশ্বর্য্য যে কোনও সময় কল্পনায় এনেছে, সব এখানে দেখা যায়।

মহারাজ বল্‌লেন, "অমলা, এসব তোমার হবে। এত ধনরত্ন পেয়েও কি তুমি খুসি নও?"

অমলা বল্‌লে, "এগুলি দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, কিন্তু এগুলি আমার হবে মনে ক'রে কিছু বেশী আনন্দ হচ্ছে না।"

মহারাজ আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর অমলাকে প্রাসাদের অন্যদিকের আর-একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বল্‌লেন, "তুমি এখানে এখন থাক। ঐ রূপোর ঘণ্টাটি বাজালেই দাস-দাসীরা এসে তোমার হুকুম পালন করবে। আমি কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।

প্রাসাদটা আরও ভাল ক'রে দেখ, তাহলে হয়ত এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছা করবে।"

অমলা বল্‌লে, "যাবার আগে আমায় ব'লে যান, আমায় কেন এরকম ক'রে ধ'রে আনা হল!"

মহারাজ বল্‌লেন, "আমার রাণী হবার জন্যে। এ দেশের নাম কল্পরাজ্য, এখানের রাজা রাণী সব বাইরের থেকে নিয়ে আসতে হয়। লোক-জন যাদের এখানে দেখছ, সবই অন্য জায়গা থেকে এসেছে, এখানে কারও জন্ম হয়নি। এখানে এসে খুসি মনে থাকতে হয়, না হলে এ রাজ্যে থাকবার নিয়ম নেই। যে দেশ ছেড়ে আসবে, সেখানের কোনও কিছুর জন্যে যদি মনে দুঃখ হয়, তা হলে তখনই যেখানকার মানুষ, সেখানে ফিরে যাবে।"

অমলা জিজ্ঞাসা করল, "পার্ব্বতীকে কি তোমরাই ধ'রে এনেছিলে?"

মহারাজ বল্‌লেন, "হ্যাঁ। কিন্তু অনেক দিন এখানে থেকেও তার মন বসল না, খালি মা, বাবা, ভাই-বোনের জন্য সে কাঁদত, তাই তাকে ফিরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

অমলা জিজ্ঞাসা করল, "সে কিছু মনে করতে পারে না কেন?"

মহারাজ বল্‌লেন, "আমরা যাকে ফিরিয়ে পাঠাই, তার স্মৃতি কেড়ে নিই, নইলে আমাদের এই গুপ্ত-রাজ্যের পথ সবাই জেনে নেবে যে?"

মহারাজ চ'লে গেলেন। সারাদিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে অমলা এই অতি আশ্চর্য্য প্রাসাদের সব ঘর দেখতে লাগল। যত দেখে, তত তার বিস্ময় বেড়ে যায়। দাস-দাসীরা তার হুকুম পালনের জন্য চারিদিকে ঘুরছে, কিন্তু অমলা কি হুকুম দেবে ভেবে পায় না। চারিধারের ঐশ্বর্য্য দে'খে তার চোখ যত মুগ্ধ হচ্ছে, মন তত ভার হয়ে আস্‌ছে। কোনও কিছুতেই যেন আনন্দ নেই, কোনও জিনিষকেই নিজের ব'লে মনে হয় না। সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ জ্ব'লে উঠল, অমলা তখন ম্লান মুখে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এত আলোর ঝক্‌ঝকানি তার আর ভাল লাগ্‌ছিল না।

পরদিন ভোর হতেই নহবতের বাজনার সঙ্গে

সঙ্গে মহারাজের রথ এসে প্রাসাদের সামনে দাঁড়াল। শাদা-পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে, হীরার মুকুট পরা মহারাজ অমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অমলা, আজ কেমন লাগছে এ দেশটা ?"

অমলা ম্লান মুখে বল্‌লে, "আগেরই মত।"

মহারাজ বল্‌লেন, "তোমার বাপ নেই, মা-ভাই-বোন কেউ নেই, তুমি গরীব অনাথিনী মেয়ে। কিসের টানে আবার সেই দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে যেতে চাও ?"

অমলা বল্‌লে, "মহারাজ, আমি আমার সেই বাগানের মধ্যে কুটীরখানি কিছুতেই ভুল্‌তে পারছি না। সেই ঝুম্‌কো লতার বেড়া, সেই বকুল-টগর-করবীর গাছ, সেই মাধবীলতার কুঞ্জ, বর্ষার জল প্রথম পৃথিবীর বুকে পড়্‌লে যে সুগন্ধ বেরিয়ে আসে মাটীর বুকের থেকে, তা যেন আমাকে ডাকছে। আমাদের তরঙ্গিণী নদীর ঢেউগুলি আমায় ডাকছে। মাটীর মায়া আমি ছাড়্‌তে পারব না, আমি ফিরে যেতে চাই।"

রাগে মহারাজের মুখ কালো হয়ে উঠ্‌ল, যেন

ঝড়ের মেঘের মত। হাতের হীরার দণ্ড অমলার কপালে ছুঁইয়ে বললেন, "ফিরে যাও নির্ব্বোধ মেয়ে। এখানের সব স্মৃতি তোমার মন থেকে মুছে যাক্।"

অমলা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "দোহাই মহারাজ, এমন শাস্তি আমায় দেবেন না। পার্ব্বতীর মত জড়-বুদ্ধিহীন হয়ে আমি বাঁচতে প্যারব না। আমার মা, বাবা, ভাই-বোন, সবাই আমায় ছেড়ে গেছে, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তারা বেঁচে আছে। আমার ছেলে-বেলাকার সুন্দর দিন-গুলি, আকাশের কত রং, আমার বাগানের কুটীরের কত ছবি, সব আমার মন জুড়ে আছে। সব গেলে, আমার বেঁচে কি হবে?"

মহারাজ বল্‌লেন, "আচ্ছা, তুমি নির্ব্বোধ হলেও, স্বভাব ভাল। তোমায় আমি বেশী কঠিন শাস্তি দেব না। এখানকারই স্মৃতি শুধু তোমার মন থেকে মুছে যাবে, আর আগেকার সব কথা মনে থাকবে। পার্ব্বতী বড় লোভী, তাই তার

শাস্তিও বেশী। সে লুকিয়ে এখানকার বাছা বাছা মণিমুক্তা নিয়ে যাচ্ছিল।”

অমলা মহারাজকে প্রণাম ক’রে বল্‌লে, “বিদায়, মহারাজ! এখানকার আর সব ভুলব ব’লে দুঃখ হচ্ছে না, আপনার দয়ার কথা ভুলব এই আমার দুঃখ”—বল্‌তে বল্‌তে কল্পরাজ্য যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অমলা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌ল। ভাবলে, “মা গো মা, আমার হয়েছে কি? অন্ধকার হয়ে এল, আর আমি এই ভর-সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে ব’সে ঢুল্‌ছি? এখন পথ দে’খে বাড়ী ফিরে যেতে পারলে হয়!”

তাড়াতাড়ি এক কলসী জল তুলে নিয়ে অমলা হন্‌ হন্‌ ক’রে বাড়ীর দিকে চলতে লাগ্‌ল।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

সুন্দরবনের পথে

বহু-চিত্র-সম্বলিত—মূল্য ৵০ আনা

বাঙ্গালা ভাষায় এই ধরণের পুস্তক আর নাই। নায়ককে কত গ্রাম ও জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবনের পথে অসীম সাহসে, অপূর্ব্ব কৌশলে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—হিংস্রজন্তু, দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত, ভয়ঙ্কর ঝড় ও বান, কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই—এই লোমহর্ষক বৃত্তান্ত পাঠককে রোমাঞ্চিত করিবে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

ব্রেজিলের বন

বহু চিত্র সম্বলিত—মূল্য—৵০ আনা

নানা অদ্ভুত জলজন্তু ও মৎস্য-পরিপূর্ণ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী আমেজন দিয়া বহুমূল্য কাষ্ঠের সন্ধানে যাত্রা করিয়া এক বণিককে কিরূপে নৃশংস জংলীদের কবলে পতিত হইতে হয় এবং কি কৌশলে মুক্ত হইয়া পলায়নকালে দুর্ভেদ্য বনপথে প্রতিপদে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়—ইহাতে তাহা অতি চমকপ্রদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।